হীরামানিক জ্বলে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হীরামানিক জ্বলে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১. ছোট্ট গ্রাম সুন্দরপুর.....3
২. প্যারিস প্লাস্টার.....27
৩. মন্দিরের প্রাঙ্গণে.....74

১. ছোট্ট গ্রাম সুন্দরপুর

ছোট্ট গ্রাম সুন্দরপুর।

একটি নদীও আছে গ্রামের উত্তর প্রান্তে। মহকুমা থেকে বারো-তেরো মাইল, রেলস্টেশন থেকেও সাত-আট মাইল।

গ্রামের মুস্তাফি বংশ এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন, এখন তাঁদের অবস্থা আগের মতো না থাকলেও আশপাশের অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে তাঁরাই এখনও পর্যন্ত বড়োলোক বলে গণ্য, যদিও ভাঙা পুজোর দালানে আগের মতো জাঁকজমকে এখন আর পুজো হয় না–প্রকান্ড বাড়ির যে মহলগুলোর ছাদ খসে পড়েছে গত বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে, সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না, বাড়ির মেয়েদের বিবাহ দিতে হয় কেরানি পাত্রদের সঙ্গে–অর্থের এতই অভাব।

সুশীল এই বংশের ছেলে। ম্যাট্রিক পাস করে বাড়ি বসে আছে–বড়ো বংশের ছেলে, তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কখনো চাকুরি করেননি, সুতরাং বাড়ি বসেই বাপের অন্ন ধ্বংস করুক, এই ছিল বাড়ির সকলেরই প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়।

সুশীল তাই করে আসছে অবশ্যি।

সুন্দরপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস খুব বেশি নেই–আগে অনেক ভদ্র গৃহস্থের বাস ছিল, তাদের সবাই এখন বিদেশে চাকুরি করে–বড়ো বড়ো বাড়ি জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে।

মুস্তাফিদের প্রকান্ড ভদ্রাসনের দক্ষিণে ও পূর্বে তাঁদের দৌহিত্র রায় বংশ বাস করে। পূর্বে যখন মুস্তাফিদের সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল তখন বিদেশ থেকে কুলগৌরব-সম্পন্ন রায়দের আনিয়ে কন্যাদান করে জমি দিয়ে এখানেই বাস করিয়েছিলেন এঁরা।

কালের বিপর্যয়ে সেই রায় বংশের ছেলেরা এখন সুশিক্ষিত ও প্রায় সকলেই বিদেশে ভালো চাকুরি করে। নগদ টাকার মুখ দেখতে পায়–বাড়ি কেউ বড়ো একটা আসে না–যখন আসে তখন খুব বড়োমানুষি চাল দেখিয়ে যায়। পদে পদে মাতুল বংশের ওপর টেক্কা দিয়ে চলাই যেন তাদের দু-একমাস-স্থায়ী পল্লিবাসের সর্বপ্রধান লক্ষ্য।

আশ্বিন মাস। পুজোর বেশি দিন দেরি নেই।

অঘোর রায়ের বড়ো ছেলে অবনী সস্ত্রীক বাড়ি এসেছে। শোনা যাচ্ছে, দুর্গোৎসব না করলেও অবনী এবার ধুমধামে নাকি কালী পুজো করবে। অবনী সরকারি দপ্তরে ভালো চাকুরি করে। অবনীর বাবা অঘোর রায় ছেলের কাছেই বিদেশে থাকেন। তিনি এ-সময় বাড়ি আসেননি, তাঁর মেজো ছেলে অখিলের সঙ্গে পুরী গিয়েছেন। অখিল যেন কোথাকার সাবডেপুটি–পনেরো দিন ছুটি নিয়ে স্ত্রীপুত্র ও বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে বেড়াতে বার হয়েছে।

সুশীল অবনীদের বৈঠকখানায় বসে এদের চালবাজির কথা শুনছিল অনেকক্ষণ থেকে।

অবনী বললে–মামা, তোমাদের বড়ো শতরঞ্জি আছে?

একখানা দালানজোড়া শতরঞ্জি তো ছিল জানি–কিন্তু সেটা ছিঁড়ে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়।

ছেঁড়া শতরঞ্জি আমার চলবে না। তাহলে কলকাতায় লোক পাঠিয়ে ভালো একখানি বড়ো শতরঞ্জি কিনে আনি, বন্ধুবান্ধব পাঁচজনে আসবে, তাদের সামনে বার করার উপযুক্ত হওয়া চাই তো! বড়ো আলো আছে?

বাতির ঝাড় ছিল, এক-এক থাকে কাঁচ খুলে গিয়েছে–তাতে চলে তো নিও।

তোমাদের তাতেই কাজ চলে?

কেন চলবে না? দেখায় খুব ভালো। তা ছাড়া দুর্গোৎসবের কাজ দিনমানেই বেশি–রাত্রে আরতি হয়ে গেলেই আলোর কাজ তো মিটে গেল।

আমায় ডে-লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি। কালী পুজোর রাতে আলোর ব্যবস্থা একটু ভালোরকম থাকা দরকার। ইলেকট্রিক আলোয় বারো মাস বাস করা অভ্যেস, সত্যি পাড়াগাঁয়ে এসে এমন অসুবিধে হয়!

বৃদ্ধ সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলি তাঁর ছোটো ছেলের একটা চাকুরির জন্যে অবনীর কাছে ক-দিন ধরে হাঁটাহাঁটি করে একটু–অবশ্যি খুব সামান্যই একটু–ভরসা পেয়েছিলেন, তিনি অমনি বলে উঠলেন–তা অসুবিধে হবে না? বলি তোমরা বাবাজি কীরকম জায়গায় থাক, কী ধরনে থাক–তা আমার জানা আছে তো! গঙ্গাচানের যোগে কলকাতা গেলেই তোমাদের ওখানে গিয়ে উঠি, আর সে কী যত্ন। ওঃ, ইলেকটিরি আলো না হলে কি বাবাজি তোমাদের চলে।

সুশীল কলকাতায় দু-একবার মাত্র গিয়েছে,–আধুনিক সভ্যতার যুগের নতুন জিনিসই তার অপরিচিত–শিক্ষিত ও শহুরেবাবু অবনীর সঙ্গে ভয়ে ভয়ে তাকে কথা বলতে হয়।

তবুও সে বললে–ডে-লাইটের চেয়ে কিন্তু ঝাড় লণ্ঠন দেখায় ভালো—

অবনী হেসে গড়িয়ে পড়ে আর-কী!

ওহে যে যুগে জমিদারপুত্রেরা নিষ্কর্মা বসে থাকত আর হাতিতে চড়ে জরদগবের মতো ঘুরে বেড়াত–ওসব চাল ছিল সেকালের। মডার্ন যুগে ওসব অচল, বুঝলে মামা? এ হল প্রগতির যুগ–হ্যাঁতির বদলে এসেছে ইলেকট্রিক লাইট–সেকালকে আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে?

বনেদি পুরোনো আমলের চালচলনে আবাল্য অভ্যস্ত সুশীল। বয়সে যুবক হলেও প্রাচীনের ভক্ত।

সে বললে–কেন, হাতি চড়াটা কী খারাপ দেখলে?

রামো:! জবড়জং ব্যাপার! হাতির মতো মোটা জানোয়ারের ওপর বসে-থাকা পেটমোটা নাদুস-নুদুস–

সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলি বললেন–গোবর-গণেশ–

জমিদারের ছেলেরই শোভা পায়, কিন্তু কাজে যারা ব্যস্ত, সময় যাদের হাতে কম, দিনে যাদের ত্রিশ মাইল চক্কর দিয়ে বেড়াতে হয় নিজের কাজে বা অফিসের কাজে তাদের পক্ষে দরকার মোটর বাইক বা মোটর কার। স্মার্ট যারা–তাদের উপযুক্ত যানই হচ্ছে–

সুশীল প্রতিবাদ করে বললে–স্মার্ট কারা জানি নে; মোগল বাদশাহের সময় আকবর আওরঙ্গজেবের মতো বীর হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করত–তারা স্মার্ট হল না–হল তোমাদের কলকাতার আদ্দির-পাঞ্জাবি-পরা চশমা-চোখে ছোকরাবাবুর দল, যারা বাপের পয়সায় গড়ের মাঠে হাওয়া খায়–কিংবা শখে পড়ে দু-দশ কদম মোটর ড্রাইভ করে, তারা? অত বড়ো সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, তারা হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করত, পুরুরাজ হাতির পিঠে চড়ে আলেকজাণ্ডারের গ্রিক বাহিনীর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল–তারা স্মার্ট ছিল না, স্মার্ট হল সিনেমার ছোকরা অ্যাক্টরের দল?

সুশীল সেখান থেকে উঠে চলে এল। অবনীর ধরন-ধারণ তার ভালো লাগেনি–দূর সম্পর্কের মামা-ভাগনে, কোন-কালের দৌহিত্র বংশের লোক, এই পর্যন্ত। এখন

তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কি যোগ আছে?–কিছুই না। জমিদারের ছেলেদের ওপরঅবনীর এ কটাক্ষ, সুশীলের মনে হল তাকে লক্ষ করে করা হয়েছে।

তা করতে পারে–এরা এখন সব হঠাৎ-বড়োলোকের দল, পুরোনো বংশের ওপরএদের রাগ থাকা অসম্ভব নয়।

সুশীল জমিদারপুত্রও বটে, নিষ্কর্মাও বটে। বসে খেতে খেতে দিনকতক পরে পেটমোটা হয়েও উঠবে–এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ। অবনী তাকে লক্ষ করেই বলেছে নিশ্চয়ই।

বাড়ি এসে সুশীল জ্যাঠামশায়কে জিজ্ঞেস করলে–আচ্ছা জ্যাঠামণি, আমাদের বংশে কখনো কেউ চাকরি করেছে?

জ্যাঠামশায় তারাকান্ত মুস্তাফির বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তিনি পুজোর দালানের সঙ্গের ছোটো কুঠরিতে সারাদিন বৈষয়িক কাগজপত্র দেখেন এবং মাঝে মাঝে গীতা পাঠ করেন। ঘরটার কুলুঙ্গিতে ও দেওয়ালের গায়ের তাকে গত পঞ্চাশ বছরের পুরোনো পাঁজি সাজানো। তারাকান্ত বললেন–কেন বাবা সুশীল? এ বংশে কারো কোনো ভাবনা ছিল যে চাকুরি করবে?

ছেলেরা কী করত জ্যাঠামণি?

পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে খেয়ে আমাদের পুরুষানুক্রমে চলে আসছে–তবে আজকাল বড়ো খারাপ সময় পড়েছে, জমিজমাও অনেক বেরিয়ে গেল–তাইযা-হয় একটু কষ্ট যাচ্ছে। কী আবার করবে কে? ওতে আমাদের মান যায়।

সুশীল কথাটা ভেবে দেখলে অবসর সময়ে। অবনীর কথাগুলো হিংসেতে ভরা ছিল এখন দেখা যাচ্ছে। অবনীদের বাইরে বেরিয়ে চাকুরি না করলে চলে না–আর তাদের চিরকাল চলে আসছে বাড়ি বসে–এতে অবনীর হিংসের কথা বই কী।

মামার বাড়ি খেয়ে চিরকাল ওরা মানুষ। আজ হঠাৎ বড়োলোক হয়ে চাল দেওয়া কথাবার্তায় সেই মাতুল বংশকেই ছোটো করতে চায়।

সুশীল এর প্রমাণ অন্য একদিক থেকে খুব শিগগিরই পেলে। মুস্তাফিদের সাবেকি পুজোর মন্ডপে দুর্গোৎসব টিমটিম করে সমাধা হল–লোকের পাতে হেঁচড়া, কলাইয়ের ডাল, খেতের রাঙা নাগরা চালের ভাত, পুকুরের মাছ, জোলো দুধোলো দই ও চিনির ডেলা ঘোঙা মোন্ডা খাইয়ে–কিন্তু অবনীদের বাড়িতে যে কালী পুজো হল–সে একটা দেখবার জিনিস!

কালী পুজোর রাত্রে গাঁ-সুদ্ধ পোলাও মাংস, কলকাতা থেকে আনা দই রাবড়ি সন্দেশ খেলে। টিন টিন দামি সিগারেট নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিলি হল, পরদিন দুপুরে যাত্রা ও ভাসানের রাত্রে প্রীতি সম্মেলনে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। অবনীর এক বন্ধু আবার ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড দেখিয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতাও করলে। গ্রামের লোক সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। এ গাঁয়ে এমনটি আর কখনো হয়নি–কেউ দেখেনি! সকলের মুখে অবনীর সুখ্যাতি।

কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না, যদি তারা সেইসঙ্গে অমনি মুস্তাফি জমিদারদের ছোটো করে না দিত।

নাঃ, মুস্তাফিরা কখনো এদের সঙ্গে দাঁড়ায়? বলে–কীসে আর কীসে!

যা বলেছ ভায়া! নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না—

শুধু লম্বা লম্বা কথা আছে–আর কিছু নেই রে ভাই।

এ-ধরনের একটা কথা একদিন সুশীলের নিজের কানেই গেল। নিজেদের পুকুরের ঘাটে বসে সুশীল ছিপে মাছ ধরছে, গাঁয়ের ওর পরিচিত দু-টি ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে পথ দিয়ে যাচ্ছেন। একজন বললেন–মুস্তাফিদের ওপর এবার খুব একহাত নিয়েছে অবনী! অপরজন বললে–তার মানে মুস্তাফিদের আর কিছু নেই। সব ছেলেগুলো বাড়ি বসে বসে খাবে, আজকালকার দিনে কি আর সেকেলে বনেদি চাল চলে? লেখাপড়া তো একটা ছেলেও ভালো করে শিখলে না–

লেখাপড়া শিখেও তো ওই সুশীলটা বাপের হোটেলে দিব্যি বসে খাচ্ছে–ওদের কখনো কিছু হবে না বলে দিলাম। যত সব আলসে আর কুঁড়ে।

কথাটা সুশীলের মনে লাগল। এদিক থেকে সে কোনোদিন নিজেকে বিচার করে দেখেনি। চিরকাল তো এইরকম হয়ে আসছে তাদের বংশে, এতদিন কেউ কিছু বলেনি, আজকাল বলে কেন তবে?

পাশের গ্রামে সুশীলের এক বন্ধু থাকত, সুশীল তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে। ছেলেটির নাম প্রমথ, তার বাবা এক সময়ে মুস্তাফিদের স্টেটের নায়েব ছিলেন, কিন্তু তারপর চাকুরি ছেড়ে মাল-চালানি ব্যাবসা করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন।

প্রমথ বেশ বুদ্ধিমান ও বলিষ্ঠ যুবক। সে নিজের চেষ্টায় গ্রামে একটা নৈশ স্কুল করেছে, একটা দরিদ্র-ভান্ডার খুলেছে–তার পেছনে গ্রামের তরুণদের যে দলটি গড়ে উঠেছে–

গ্রামের মঙ্গলের জন্যে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই। সম্প্রতি প্রমথ বাবার আড়তে বেরোতে আরম্ভ করেছে।

সুশীল বললে–প্রমথ, আমাকে তোমাদের আড়তে কাজ শেখাবে?

প্রমথ আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে চেয়ে বললে–কেন বলো তো? হঠাৎ একথা কেন তোমার মুখে?

বসে বসে চিরকাল বাপের ভাত খাব?

তোমাদের বংশে কেউ কখনো অন্য কাজ করেনি, তাই বলছি। হঠাৎ এ মতিবুদ্ধি ঘটল কেন তোমার?

সেসব বলব পরে। আপাতত একটা হিল্লে করে দাও তো।

ওর মধ্যে কঠিন আর কী? যেদিন ইচ্ছে এসো, বাবার কাছে নিয়ে যাব।

মাস খানেক ধরে সুশীল ওদের আড়তে বেরোতে লাগল, কিন্তু ক্রমশ সে দেখলে, ভুসি মাল চালানির কাজের সঙ্গে তার অন্তরের যোগাযোগ নেই। তার বাবা ছেলেকে আড়তে যোগ দিতে বাধা দেননি, বরং বলেছিল ব্যাবসার কাজে যদি কিছু টাকা দরকার হয়, তাও তিনি দেবেন।

একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন–আড়তের কাজ কীরকম হচ্ছে?

সুশীল বললে–ও ভালো লাগে না, তার চেয়ে বরং ডাক্তারি পড়ি।

তোমার ইচ্ছে। তাহলে কলকাতায় গিয়ে দেখে-শুনে এসো।

কলকাতায় এসে সুশীল দেখলে, ডাক্তারি স্কুলে ভরতি হবার সময় এখন নয়। ওদের বছর আরম্ভ হয় জুলাই মাসে–তার এখনও তিন চার মাস দেরি। সুশীলের এক মামা খিদিরপুরে বাসা করে থাকতেন, তাঁর বাসাতেই সুশীল এসে উঠেছিল–তাঁরই পরামর্শে সে দু-একটা অফিসে কাজের চেষ্টা করতে লাগল।

দিন-পনেরো অনেক অফিসে ঘোরাফেরা করেও সে কোথাও কোনো কাজের সুবিধে করতে পারলে না–এদিকে টাকা এল ফুরিয়ে। মামার বাসায় খাবার খরচ লাগত না অবশ্য, কিন্তু হাতখরচের জন্যে রোজ একটি টাকা দরকার। বাবার কাছে সে চাইবে না–নগদ টাকার সেখানে বড়ো টানাটানি, সে জানে। একটা কিছু না করে এবার বাড়ি

ফিরবার ইচ্ছে নেই তার। অথচ করাই বা যায় কী? সন্ধ্যার দিকে গড়ের মাঠে বসে রোজ ভাবে।

সুশীল সেদিন গড়ের মাঠের একটা নির্জন জায়গায় বসেছিল চুপ করে। বড্ড গরম পড়ে গিয়েছে–খিদিরপুরে তার মামার বাসাটিও ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের চিৎকার ও উপদ্রবে সদা সরগরম–সেখানে গিয়ে একটা ঘরে তিন-চারটি আট-দশ বছরের মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে একঘরে রাত কাটাতে হবে। সুশীলের ভালো লাগে না আদৌ। তাদের অবস্থা এখন খারাপ হতে পারে, কিন্তু দেশের বাড়িতে জায়গার কোনো অভাব নেই।

ওপরে নীচে বড়ো ঘর আছে–লম্বা লম্বা দালান, বারান্দা–পুকুরের ধারের দিকে বাইরের মহলে এত বড়ো একটা রোয়াক আছে যে, সেখানে অনায়াসে একটা যাত্রার আসর হতে পারে।

এমন সব জ্যোৎস্না রাতে কতদিন সে পুকুরের ধারে ওই রোয়াকটায় একা বসে কাটিয়েছে। পুকুরের ওপারে নারিকেল গাছের সারি, তার পেছনে রাধাগোবিন্দের মন্দিরের চুড়োটা, সামনের দিকে ওর ঠাকুরদাদার আমলের পুরোনো বৈঠকখানা। এ বৈঠকখানায় এখন আর কেউ বসে না–কাঠ ও বিচুলি, শুকনো তেঁতুল, ভুসি খুঁটে ইত্যাদি রাখা হয় বর্ষাকালে।

মাঝে মাঝে সাপ বেরোয় এখানে।

সেবার ভাদ্র মাসে তালনবমীর ব্রতের বাহ্মণ ভোজন হচ্ছে পুজোর দালানে, হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শোনা গেল পুকুরপাড়ের পুরোনো বৈঠকখানার দিক থেকে।

সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, হরি চাকর বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকেছিল বিচুলি পাড়বার জন্যে সেই সময় কী সাপে তাকে কামড়েছে।

হইহই হল। লোকজন এসে সারা বৈঠকখানার মালামাল বার করে সাপের খোঁজ করতে লাগল। কিছু গেল না দেখা। হরি চাকর বললে সে সাপ দেখেনি, বিচুলির মধ্যে থেকে তাকে কামড়েছে।

ওঝার জন্যে রানিনগরে খবর গেল। রানিনগরের সাপের ওঝা তিনটে জেলার মধ্যে বিখ্যাত–তারা এসে ঝাড়ফুঁক করে হরিকে সে-যাত্রা বাঁচালে। লোকজনে খুঁজে সাপও বের করলে–প্রকান্ড খয়ে-গোখরো। হরি যে বেঁচে গেল, তার পুনর্জন্ম বলতে হবে।

বাবু, ম্যাচিস আছে–ম্যাচিস?

সুশীল চমকে মাথা তুলে দেখলে, একটি কালোমতো লোক। অন্ধকারে ভালো দেখা গেল না। নিম্নশ্রেণির অশিক্ষিত অবাঙালি লোক বলেই সুশীলের ধারণা হল–কারণ তারাই সাধারণত দেশলাইকে ম্যাচিস বলে থাকে।

সুশীল ধূমপান করে না, সুতরাং সে দেশলাইও রাখে না। সে-কথা লোকটাকে বলতে সে চলেই যাচ্ছিল–কিন্তু খানিকটা গিয়ে আবার অন্ধকারের মধ্যে যেন কী ভেবে ফিরে এল।

সুশীলের একটু ভয় হল। লোকটিকে এবার সে ভালো করে দেখে নিয়েছে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে। বেশ সবল, শক্ত-হাত-পা-ওয়ালা চেহারা–গুণ্ডা হওয়া বিচিত্র নয়। সুশীলের পকেটে বিশেষ কিছু নেই–টাকা-তিনেক মাত্র। সুশীল একটু সতর্ক হয়ে সরে বসল। লোকটা ওর কাছে এসে বিনীত সুরে বললে–বাবুজি, দু-আনা পয়সা হবে?

সুশীল বিনা বাক্যব্যয়ে একটা দু-আনি পকেট থেকে বের করে লোকটার হাতে দিলে। তাই নিয়ে যদি খুশি হয়, হোক না। এখন ও চলে গেলে যে হয়!

চলে যাওয়ার কোনো লক্ষণ কিন্তু লোকটার মধ্যে দেখা গেল না। সে সুশীলের কাছেই এসে সকৃতজ্ঞ সুরে বললে–বহুৎ মেহেরবানি আপনার বাবু! আমার আজ খাওয়ার কিছু ছিল না–এই পয়সা লিয়ে হুটেলে গিয়ে রোটি খাব। বাবুজির ঘর কুথায়?

ভালো বিপদ দেখা যাচ্ছে! পয়সা পেয়ে তবুও নড়ে না যে! নিশ্চয় আরও কিছু পাবার মতলব আছে ওর মনে মনে। সুশীল চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলে, কাছাকাছি কেউ নেই। পকেটে টাকা তিনটে ছাড়া সোনার বোতামও আছে জামায়, হঠাৎ এখন মনে পড়ল।

ও উত্তর দিলে–কলকাতাতেই বাড়ি, বালিগঞ্জে। আমার কাকা পুলিশে কাজ করেন কিনা, এদিকে রোজ বেড়াতে আসেন মোটর নিয়ে। এতক্ষণে এলেন বলে, রেড রোডে মোটর রেখে এখানেই আসবেন। আমি এখানে থাকি রোজ, উনি জানেন।

বেশ বাবু, আপনাকে দেখেই বড়ো ঘরানা বলে মনে হয়।

সুশীলের মনে কৌতূহল হওয়াতে সে বললে–তুমি কোথায় থাক?

মেটেবুরুজে বাবুজি।

কিছু কর নাকি?

জাহাজে কাজ করতাম, এখন কাজ নেই। ঘুরি-ফিরি কাজের খোঁজে। রোটির জোগাড় করতে হবে তো?

লোকটার সম্বন্ধে সুশীলের কৌতূহল আরও বেড়ে উঠল। তা ছাড়া লোকটার কথাবার্তার ধরনে মনে হয় লোকটা খুব খারাপ ধরনের নয় হয়তো। সুশীল বললে–জাহাজে কতদিন খালাসিগিরি করছ?

দশ বছরের কুছু ওপর হবে।

কোন কোন দেশে গিয়েছ?

সব দেশে। যে দেশে বলবেন সে দেশে। জাপান লাইন, বিলেত লাইন, জাভা-সুমাত্রার লাইন–এস এস পেনগুইন, এস এস গোলকুন্ডা–এস এস নলডেরা, পিয়েনোর বড়ো জাহাজ নলডেরা, নাম শুনেছেন?

পিয়েনো কী জিনিস, পল্লিগ্রামের সুশীল তা বুঝতে পারলে না। না, ওসব নাম সে শোনেনি।

তা বাবুজি, আপনার কাছে ছিপাব না। সরাব পিয়ে পিয়ে কাজটা খারাবি হয়ে পড়ল, জাহাজ থেকে ডিসচার্জ করে দিলে। এখন এই কোষ্টো যাচ্ছে, মুখ ফুটে কাউকে বলতে ভি পারিনি। কী করব, নসিব বাবুজি!

জাহাজের কাজ আবার পাবে না?

পাব বাবুজি, ডিসচার্জ সার্টিক-ফিটিক ভালো আছে। সরাব টরাবের কথা ওতে কুছু নেই। কাপ্তানটা ভালো লোক, তাকে কেঁদে গোড়-পাকড়ে বললাম–সাহেব আমার রোটি মেরো না। ওকথা লিখো না!

লোকটি আর-একটু কাছে এসে ঘেঁষে বসল। বললে–আমার নসিব খারাপ বাবু–নয় তো আমায় আজ চাকরি করে খেতে হবে কেন? আজ তো আমি রাজা!

সুশীল মৃদু কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞাসা করলে–কীরকম?

লোকটি এদিক-ওদিক চেয়ে সুর নামিয়ে বললে–আজ আর বলব না। এইখানে কাল আপনি আসতে পারবেন?

কেন পারব না?

তাই আসবেন কাল। আচ্ছা বাবু, আপনি পুরোনো লিখা পড়তে পারেন?

সুশীল একটু আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে–কী লেখা?

সে কাল বালাব। আপনি কাল এখানে আসবেন, তবে, বেলা থাকতে আসবেন–সুর ডুববার আগে।

মামার বাসায় এসে কৌতূহলে সুশীলের রাতে চোখে ঘুমই এল না। এক-একবার তার মনে হল, জাহাজি মাল্লা কত দূর কত দেশ ঘুরেছে, কোনো এক আশ্চর্য ব্যাপারের কথা কি তাকে বলবে? কেননা নতুন দেশের কথা? পুরোনো লেখা কীসের? ...

ওর ছোটো মামাতো ভাই সনৎ ওর পাশেই শোয়। গরমে তারও চোখে ঘুম নেই। খানিকটা উশখুশ করার পরে সে উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। বললে–দাদা চা খাবে? চা করব?

এত রাত্তিরে চা কী রে?

কী করি বল। ঘুম আসছে না চোখে–খাও একটু চা।

সনৎ ছেলেটিকে সুশীল খুব পছন্দ করে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, লেখা-পড়াতেও ভালো, ফুটবল খেলায় এরই মধ্যে বেশ নাম করেছে, কলেজ টিমের বড়ো বড়ো ম্যাচে খেলবার সময় ওকে ভিন্ন চলে না।

সনৎ-এর আর একটা গুণ, ভয় বলে কোনো জিনিস নেই তার শরীরে। মনে হয় দুনিয়ার কোনো কিছুকে সে গ্রাহ্য করে না। দু-বার এই স্বভাবের দোষে তাকে বিপদে পড়তে হয়েছিল, একবার খেলার মাঠে এক সার্জেন্টের সঙ্গে মারামারি করে, নিজে তাতে মার খেয়েছিলও, খুব-মার দিয়েছিলও। সেবার ওর বাবা টাকাকড়ি খরচ করে ওকে জেলের দরজা থেকে ফিরিয়ে আনেন। আর একবার মাহেশের রথতলায় একটি মেয়েকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে গুন্ডার ছুরিতে প্রায় প্রাণ দিয়েছিল আর-কী। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক যুবকদল ওকে গুণ্ডাদের মাঝখান থেকে টেনে উদ্ধার করে আনে।

সুশীল বললে–সনৎ কতদূর লেখাপড়া করবি ভাবছিস?

দেখি দাদা। বি. এসসি. পর্যন্ত পড়ে একটা কারখানায় ঢুকে কাজ শিখব। কলকবজার দিকে আমার ঝোঁক, সে তো তুমি জানই–

আমি যদি কোনো ব্যবসায় নামি, আমার সঙ্গে থাকবি তুই?

নিশ্চয়ই থাকব। তুমি যেখানে থাকবে, যা করবে–আমি তাতে থাকি এ আমার বড়ো ইচ্ছে কিন্তু। কী ব্যাবসা করবে ভাবছ দাদা?

আচ্ছা, কাউকে এখন এসব কিছু বলিস নে। তোকে আমি জানাব ঠিক সময়ে। তোকে নইলে আমার চলবে না। চল আজ শুয়ে পড়ি–রাত দুটো বাজে–

পরদিন সুশীল গড়ের মাঠে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে একা বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল–তবুও লোকটির দেখা নেই।

অন্ধকার নামল। আসবে না সে লোক? হয়তো নয়। কী একটা বলবে ভেবেছিল কাল, রাতারাতি তার মন ঘুরে গেছে।

রাত আটটার সময় সুশীল উঠতে যাবে, এমন সময়ে পেছনে পায়ের শব্দ শুনে সে চেয়ে দেখলে।

পরক্ষণেই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

লোকটা ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে।

সেলাম, বাবুজি! মাপ করবেন, বড়ো দেরি হয়ে গেল। এই দেখুন–

লোকটার পায়ের ওপর দিয়ে ভারি একটা জিনিস চলে গিয়েছে যেন। সাদা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা–কিন্তু ব্যাণ্ডেজ রক্তে ভিজে উঠেছে।

সুশীল বললে–এঃ, কী হয়েছে পায়ে?

এই জন্যেই দেরি হয়ে গেল বাবুজি। বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আর একটা ভারী হাতেঠেলা গাড়ি পায়ের ওপর এসে পড়ল। দু-জন লোক ঠেলছিল, তাদের সঙ্গে মারামারি হয়ে গেল আমার সঙ্গের লোকদের।

বোসো বোসো। তোমার পায়ে দেখছি সাঙ্ঘাতিক লেগেছে! না এলেই পারতে!

না এলে আপনি তো হারিয়ে যেতেন। আপনাকে আর পেতাম কোথায়? রিকশা করে এসেছি বাবুজি, দাঁড়াতে পারছি নে!

লোকটা ঘাসের ওপর বসে পড়ল। বললে–আজ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বাবুজি, আজ কোনো কাজ হবে না।

লোকটা কথা বলবে, সুশীল শুনবে। এতে দিনের আলোর কী দরকার, সুশীল বুঝতে পারলে না। বললে–কী কথা বলবে বলেছিলে–বলে যাও না?

লোকটা ধীরে ধীরে চাপা গলায় অনেক কথা বললে–মোটামুটি তার বক্তব্য এই–

তার বাড়ি আগে ছিল পশ্চিমে। কিন্তু অনেকদিন থেকে সে বাংলা দেশে আছে এবং বাঙালি খালাসিদের সঙ্গে কাজ করে বাংলা শিখেছে। লোকটা মুসলমান, ওর নাম জামাতুল্লা। একবার কয়েকজন তেলুগু লস্করের সঙ্গে সে একটা জাহাজে কাজ করে–ডাচ ইস্ট-ইণ্ডিজের বিভিন্ন দ্বীপে নারকোল-কুচি বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেত মাদ্রাজ থেকে। সেই সময় একবার তাদের জাহাজ ডুবো-পাহাড়ে ধাক্কা লেগে অচল হয়ে পড়ে। সৌরাবায়া থেকে তাদের কোম্পানির অন্য জাহাজ এসে তাদের জাহাজের মাল তুলে নিয়ে যাবার আগে সাতদিন ওরা সেইখানে পড়েছিল। একদিন সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে জাহাজসুদ্ধ লোকের কলেরা হল।

এইখানে সুশীল জিজ্ঞেস করলে–সবারই কলেরা হল?

কেউ বাদ ছিল না বাবু। খাবার পাওয়া যেত না, পাহাড়ের একটা গর্তে কাঁকড়া পেয়ে সেদিন ওরা তাই ধরেছিল। ছোটো-ছোটো–লাল কাঁকড়া।

তারপর?

দু-জন বাদে বাকি সব সেই রাত্রে মারা গেল। বাবুজি, সে-রাতের কথা ভাবলে এখনও ভয় হয়। সতেরো জন দিশি লস্কর আর দু-জন ওলন্দাজ সাহেব–একজন মেট আর একজন ইঞ্জিনিয়ার–সেই রাত্রে সাবাড়। রইলাম বাকি কাপ্তান আর আমি।

তারপর জাহাজের কাপ্তান ওকে বললে–মড়াগুলি টান দিয়ে ফেলে দাও জলে—

ও বললে–আমি মুদাফরাশ নই সাহেব, ও আমি ছোঁব না—

সাহেব ওকে গুলি করে মারতে এল। ও গিয়ে লুকোলো ডেকের ঢাকনি খুলে হোল্ডের মধ্যে। সেই রাত্রে কাপ্তান সাহেব খুব মদ খেয়ে চিৎকার করে গান গাইছে–ও সেই সময় জাহাজের বোট খুলে নিয়ে নামাতে গেল।

ডেভিট থেকে বোট নামাবার শব্দে সাহেবের মদের নেশা ভাঙল না তাই নিস্তার ডেকের ওপরে তখন দুটো মড়া পড়ে রয়েছে–মরণের বীজ জাহাজের সর্বত্র ছড়ানো, ভয়ে ও কিছু খায়নি সকাল থেকে, পাছে কলেরা হয়। সুতরাং অনাহারে ও ভয়ে খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

দূরে ডাঙা দেখা যাচ্ছিল, দুপুরের দিকে ও লক্ষ করেছিল। সারারাত নৌকো বাইবার পর ভোরে এসে বোট ডাঙায় লাগল। ও নেমে দেখে ডাঙায় ভীষণ জঙ্গল–ওদেশের সব দ্বীপেই এ ধরনের জঙ্গল ও জানত। লোকজনের কোনো চিহ্ন নেই কোনোদিকে।

বোট ডাঙায় বেঁধে ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দু-দিন হাঁটলে, শুধু গাছের কচি পাতা আর এক ধরনের অম্ল-মধুর ফল খেয়ে। মানুষের বসতির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় এসে হঠাৎ একেবারে ও অবাক হয়ে গেল।

ওর সামনে প্রকান্ড বড়ো সিংহদরজা–কিন্তু বড়ো বড়ো লতাপাতা উঠে একেবারে ঢেকে ফেলে দিয়েছে। সিংহদরজার পর একটা বড়ো পাঁচিলের খানিকটা–আরও খানিক গিয়ে একটা বড়ো মন্দির, তার চুড়ো ভেঙে পড়েছে–মন্দিরের গায়ে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি বলে তার মনে হল। সে ভারতের লোক, হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি সে চেনে। এ ক্ষেত্রে হয়তো সে ঠিক চিনতে পারেনি–তবে তার ওইরকম বলেই মনে হয়েছিল।

অবাক হয়ে সে আরও ঘুরে ঘুরে দেখলে। জায়গাটা একটা বহুকালের পুরোনো শহরের ভগ্নস্তূপ মনে হল। কত মন্দির, কত ঘর, কত পাথরের সিংহদরজা, গভীর বনের মধ্যে বড়ো বড়ো কাছির মতো লতার নাগপাশ বন্ধনে জড়িয়ে কত যুগ ধরে পড়ে আছে। ভীষণ বিষধর সাপের আড্ডা সর্বত্র। একটা বড়ো ভাঙা মন্দিরে সে পাথরের প্রকান্ড বড়ো মূর্তি দেখেছিল–প্রায় আট-দশ হাত উঁচু।

সন্ধ্যা আসবার আর বেশি দেরি নেই দেখে তার বড়ো ভয় হয়ে গেল। এসব প্রাচীনকালের নগর শহর–জিন পরীর আচ্ছা, তেলুগু লস্করেরা যাকে ওদের ভাষায় বলে বিহ্মমুনি।

বিহ্মমুনি বড়ো ভয়ানক জিন, হিন্দুদের পুরোহিত মারা যাওয়ার পর বিহ্মমুনি হয়। এই গহন অরণ্যের মধ্যে লোকহীন পরিত্যক্ত বহু প্রাচীন নগরীর অলিতে-গলিতে ঝোপে ঝোপে ধুম্রবর্ণ, বিকটাকার, কত যুগের বুভুক্ষু বিহ্মমুনির দল সন্ধ্যার অন্ধকার পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিকারের সন্ধানে জাগ্রত হয়ে উঠে হাঁক পাড়ে–ম্যায় ভুখা! তাদের হাতের নাগালে

পড়লে কি আর রক্ষে আছে? অতএব এখান থেকে পালানোই একমাত্র বাঁচবার পথ।

সুশীল এক মনে শুনছিল, পালিয়ে গেলে কোথায়?

সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আবার দু-দিন তিন দিন ধরে হেঁটে সমুদ্রের ধারে পৌঁছোলাম। জাহাজে উঠব এসে এই তখন খেয়াল।

আবার সেই মড়া-ভরতি জাহাজে কেন?

বুঝলেন না বাবুজি? যদি জাহাজে উঠি, তবে তো দেশে পৌঁছোবার ঠিকানা মেলে। নয়তো সেই জংলি মুলুকে যাব কোথায়? চারিধারে সমুদ্র, যদি জাহাজ না পাই তবে সেই জংলি মুলুকে না খেয়ে মরতে হবে–নয়তো জংলি লোকেরা খুন করে ফেলবে। বাবুজি, তখন এমন ডর, যে রাতে ঘুমোতে পারি নে। একদিন প্রকান্ড এক বনমানুষের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম–নসিবের জোর খুব। অমন ধরনের জানোয়ার যে দুনিয়ায় আছে তা জানতাম না। গাছের ওপর একদল বনমানুষ ছিল–ধাড়িটা আমার দেখতে পেলে না বাবুজি, দেখলে আর বাঁচতাম না।

সুশীল মনে মনে একবার চিন্তা করে দেখলে। লোকটা মিথ্যা কথা বলছে না সত্যি বলছে, ওর এই বনমানুষের কথা তার একটা মস্ত বড়ো পরীক্ষা। সুশীল জন্তুজানোয়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়াশুনো করেছিল, বাড়িতে আগে নানারকম পাখি, বেঁজি, খরগোশ, সজারু, ও বাঁদর পুষত। গাঁয়ের লোকে ঠাট্টা করে বলত, মুস্তাফিদের চিড়িয়াখানা। এ সম্বন্ধে ইংরেজি বইও নিজের পয়সায় কিনেছিল।

ও বললে–কত বড়ো বনমানুষ?

খুব বড়ো বাবুজি। ইন্দোরের পালোয়ন রামনকিব সিং-এর চেয়েও একটা বাচ্চার গায়ে জোর বেশি। নিজের আঁখসে দেখলাম।

কী করে দেখলে?

ডাল ফাড়লে হাত আর পা দিয়ে ধরে! আমার মাথার ওপর গাছপালার ডালগুলো তো বনমানুষে বিলকুল ভরতি হয়ে গিয়েছিল।

তবে তো তুমি সুমাত্রা দ্বীপে কিংবা বোর্নিওতে গিয়েছিলে কিংবা ওর কাছাকাছি কোনো ছোটো দ্বীপে। তুমি যে বনমানুষ বলছ–ও হচ্ছে ওরাং ওটাং-ও ছাড়া আর কোনো বনমানুষ ও দেশে থাকবে না–

লোকটা হঠাৎ অত্যন্ত বিস্ময়ে সুশীলের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল–দাঁড়ান–দাঁড়ান, বাবুজি, কী জায়গার নাম করলেন আপনি?

সুমাত্রা আর বোর্নিও–

ওঃ, বাবুজি, আপনি বহুৎ পড়ালিখা আদমি! এই না, কতকাল শুনিনি জানেন? আজ দশ বারো বছর। শেষের নামটা–কী বললেন বাবুজি? বোর্নিও? ঠিক। সুলু সি-র নাম জাহাজি চার্টে দেখবেন। সুলু সি-র কাছাকাছি, এপার-ওপার। কেন জানেন বাবুজি? এই নাম শুনলে আমার বহুত কথা মনে পড়ে যায়! তাজ্জব কথা! আজ দেখচেন আমায় এই গড়ের মাঠে বসে দু-একটা পয়সা ভিক্ষে করছি–কিন্তু আমি আজ–আচ্ছা, সেকথা এখন থাক।

তারপর কী করলে বলো না! জঙ্গল থেকে এসে উঠলে আবার জাহাজে?

হ্যাঁ, উঠলাম। সেই কাপ্তান তখন মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে নিজের কেবিনে চাবি দিয়ে ঘুমোচ্ছে–আমি আগে তো ভাবলাম মরে গিয়েছে। মড়াগুলি কতক কাপ্তান ফেলে দিয়েছে –কতক তখনও রয়েছে। ভীষণ বদ গন্ধ–আর সেই গরম! আমি জাহাজের কিছু খেতে পারিনে কলেরার ভয়ে। ডাঙায় গিয়ে মাছ ধরতাম–আর কচ্ছপ।

কাপ্তেন বেঁচে ছিল?

বেঁচে ছিল, কিন্তু বেচারির মগজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল একেবারে। তখনকার দিনে বেতার ছিল না, আমাদের জাহাজে যে অমন হয়ে গেল, সে খবর কোথাও দেওয়া যায়নি। ওসব দিকের সমুদ্রে জাহাজ বেশি চলাচল করে না–জাহাজের লাইন নয়। এগারো দিন পরে সৌরাবায়া থেকে জাহাজ যাচ্ছিল পাসারাপং,–তারা আমাদের আগুন দেখে এসে জাহাজে তুলে নিয়ে বাঁচায়।

কীসের আগুন?

ডুবো পাহাড়ের খানিকটা ভাটার সময় বেরিয়ে থাকত। পাটের থলে জ্বালিয়ে সেখানে রোজ আগুন করতাম–অন্য জাহাজের যদি চোখে পড়ে। তাতেই তো বেঁচে গেলাম।

এ পর্যন্ত শুনে সুশীল বুঝতে পারলে না লোকটার ভাগ্য কীসে ফিরেছিল। তবে লোকটা যে মিথ্যা কথা বলছে না, ওর কথার ধরন থেকে সুশীলের তা মনে হল। কিন্তু এইবার লোকটা যে কাহিনি বললে, তা শেষ পর্যন্ত শুনে সুশীল বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল–অল্পক্ষণের জন্য সারা গড়ের মাঠ, এমনকী বিরাট কলকাতা শহরটাই যেন তার সমস্ত আলোর মালা নিয়ে তার চোখের সামনে থেকে গেল বেমালুম মুছে–বহু দূরের কোনো

বিপদসংকুল নীল সমুদ্রে সে একা পাড়ি জমিয়েছে বহুকালের লুকোনো হীরে-মানিক-মুক্তোর সন্ধানে–পৃথিবীর কত পর্বতে, কন্দরে, মরুতে, অরণ্যে অজানা স্বর্ণরাশি মানুষের চোখের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে–বেরিয়ে পড়তে হবে সেই লুকোনো রত্নভান্ডারের সন্ধানে –পুরুষ যদি হও! নয় তো অফিসের দোরে দোরে মেরুদন্ডহীন প্রাণীদের মতো ঘুরে ঘুরে সেলাম বাজিয়ে চাকুরির সন্ধান করে বেড়ানোই যার একমাত্র লক্ষ্য, তার ভাগ্যে নৈব চ, নৈব চ!

এই খালাসিটা হয়তো লেখাপড়া শেখেনি, হয়তো মার্জিত নয়–কিন্তু এ সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে এসেছে, দুনিয়ার বড়ো বড়ো নগর বন্দর, বড়ো বড়ো দ্বীপ দেখতে কিছু বাকি রাখেনি–এ একটা পুরুষ মানুষ বটে–কত বিপদে পড়েছে, কত বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছে!

বিপদের নামে ত্রিশ হাত পেছিয়ে থাকে যারা, গা বাঁচিয়ে চলবার ঝোঁক যাদের সারাজীবন ধরে, তাদের দ্বারা না ঘুচবে অপরের দুঃখ, না ঘুচবে তাদের নিজেদের দুঃখ। লক্ষ্মী যান না কাপুরুষের কাছে, অলসের কাছে–তাদের তিনি কৃপা করেন যারা বিপদকে, বিলাসকে, আরামপ্রিয়তাকে তুচ্ছ বোধ করে।

জাহাজ সৌরাবায়া এসে পৌঁছোবার সঙ্গেসঙ্গে ওদের দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সত্যিই ক্লান্তিতে, অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায়, অখাদ্য ভক্ষণে ওদের শরীর ভেঙে পড়েছিল। দিন পনেরো হাসপাতালে শুয়ে থাকবার পরে ক্রমশ ওর শরীর ভালো হয়ে গেল– কাপ্তেনের মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণও ক্রমে দূর হল।

ওদের জন্যে কিছু টাকা চাঁদা উঠেছিল, ও হাসপাতাল থেকে যেদিন বাইরে পা দিলে, সেদিন এক দয়াবতী মেমসাহেব ওকে টাকাটা দিয়ে গেলেন। দুস্থনাবিকদের থাকবার জন্যে গভর্নমেন্টের একটা বাড়ি আছে সেখানে ওকে বিনি খরচায় থাকবার অনুমতি দেওয়া হল।

এই বাড়িতে সে প্রায় দু-মাস ছিল, তারপর অন্য জাহাজে চাকরি নিয়ে ওখান থেকে চলে আসে। তারপর পাঁচ-সাত বছর কেটে গেল। ও যেমন জাহাজে কাজ করে তেমনি করে যাচ্ছে। প্রাচ্যদেশের বড়ো বড়ো বন্দরের মদের দোকান ও জুয়ার আড্ডার সঙ্গে তখন সে সুপরিচিত।

একবার তাদের জাহাজ ম্যানিলাতে থেমেছে। ও অন্যান্য লস্করদের সঙ্গে নিয়ে এক পরিচিত জুয়ার আড্ডায় উঠেছে–এমন সময়ে আড্ডাধারী এসে ওকে বললে–একবার এসো তো! তোমাদের দেশের একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ও অবাক হয়ে বললে–আমাদের দেশের?

আড্ডাধারী চীনাম্যান হেসে বললে–হ্যাঁ, ইণ্ডিয়ার। এতকাল দোকান করছি বন্দরে, ইণ্ডিয়ান মানুষ চিনিনে?

ও আড্ডাধারীর পিছু পিছু গিয়ে দেখলে জুয়ার আড্ডার পেছনে একটা পায়রার খোপের মতো ছোট্ট ভীষণ নোংরা ঘরে একজন লোক শুয়ে। লোকটার বয়স কত ঠিক বোঝবার জো নেই–চল্লিশও হতে পারে, আবার ষাটও হতে পারে। বিছানার সঙ্গে যেন সে মিশে গিয়েছে বহুদিন ধরে অসুখে ভুগে।

ওকে দেখে লোকটা ক্ষীণ কণ্ঠে তেলুগু ভাষায় বললে দেশের লোককে দেখতে পাইনে। যখন হংকং হাসপাতালে ছিলাম, অনেক দেশের লোক দেখতাম সেখানে। বোসস এখানে। আহা, ভারতের লোক তুমি! মুসলমান? তা কী? এতদূর বিদেশে তুমি শুধু ভারতের লোক, যে দেশের মাটিতে আমার জন্ম, সেই একই দেশের মাটিতে তোমারও জন্ম। এখানে তুমি আমার ভাই।

ও রোগীর বিছানার পাশে বসল। সেই অপরিচিত মুমূর্ষ স্বদেশবাসীকে দেখে ওর মনে একটা গভীর অনুকম্পা ও মমতা জেগে উঠল– যেন সত্যিই কতকালের আপনার জন।

রোগী বললে–আমার নাম নটরাজন, ত্রিবেন্দ্রাম শহর থেকে এগারো মাইল দূরে কাটিউপ্পা বলে ছোট্ট একটি গ্রামে আমার বাড়ি। কোচিন থেকে যে স্টিমলঞ্চ ছাড়ে ত্রিবেন্দ্রাম যাবার জন্যে, সে স্টিমার আমার গ্রামের ঘাট ছুঁয়ে যায়। বেউয়া কাপ্পিয়াম নদীর ধারে, চারিধারে ঘন আর ছোটো ছোটো পাহাড় কাটিউপ্পা গ্রাম তুমি দেখোনি, বুঝতে পারবে না সে কী চমৎকার জায়গা। আমি অনেক দেশ বেড়িয়েছি পৃথিবীর, ভবঘুরে হয়ে চিরদিন কাটিয়ে দিলাম জীবনটা–কিন্তু আমি তোমায় বলছি শোনো, ভারতবর্ষের মধ্যে তো বটেই, এমনকী পৃথিবীর মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর একটি অদ্ভুত সুন্দর দেশ। কিন্তু আমার দেশের বর্ণনা শোনাবার জন্যে আজ তোমায় আমি ডাকিনি। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, কাল যে সূর্যদেব উঠবে আকাশে, তা আমি চোখে বোধ হয় দেখতে পাব না–তুমি আমার দেশবাসী ভাই, একটা উপকার করবে আমার?

কী বলুন? আপনি আমার চাচার বয়সি, যা হুকুম করবেন বলুন। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করব।

রোগীর পান্ডুর মুখ অল্পক্ষণের জন্যে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল–নিবুনিবু প্রদীপের শিখার মতো। ওর দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে বললে–কথা দিলে? কিন্তু ভীষণ লোভ দমন করতে হবে ভাই!

আল্লার নামে বলছি, যা করতে বলবেন, তাই করব।

আমার মাথার বালিশের তলায় একটা চামড়ার ব্যাগ আছে, সেটা বার করে নাও। আমার মৃত্যুর পরে ব্যাগটা আমার গ্রামে আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবে।

ও রোগীর মাথাটা সন্তর্পণে একধারে সরিয়ে আস্তে আস্তে একটা ছোটো চামড়ার ব্যাগ বার করলে। ব্যাগের মধ্যে কতগুলো কাগজপত্র ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হল না ওর।

বৃদ্ধ নটরাজন বললে–তোমার কাছে আমি কোনো কথা লুকোব না। ব্যাগটার মধ্যে একখানা ম্যাপ আছে–জীবনে অনেক সাহসের কাজ করেছি, অনেক বনে-জঙ্গলে ঘুরেছি –অনেকরকম লোকের সঙ্গে মিশেছি। এই ম্যাপখানা এবং ব্যাগের মধ্যে যা যা আছে–তা আমি সৎপথে থেকে হস্তগত করিনি। সংক্ষেপে কথাটা বলে নিই, কারণ বেশি বলবার আমার সময় বা শক্তি নেই। আজ বিশ-বাইশ বছর আগে এই ব্যাগ আমার হস্তগত হয়। যে ম্যাপখানা এই ব্যাগের মধ্যে আছে–তার সাহায্যে যেকোনো লোক দুনিয়ায় মহাধনী লোক হয়ে যেতে পারে। সুলু সি-র একটা খাড়ির ধারে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন আমলের এক নগরের ভগ্নস্তূপ আছে। সেই নগর প্রাচীন যুগের এক হিন্দু রাজ্যের রাজধানী ছিল। তার এক জায়গায় প্রচুর ধনরত্ন লুকোনো আছে। যার কাছ থেকে এ ম্যাপ আমি পাই, সে আমারই বন্ধু, দু-জনে মিলে সুলু সমুদ্রে বোম্বেটেগিরি করেছি দশ বছর ধরে। সে জাতিতে মালয়, ম্যাপ তার তৈরি– সে নিজে ওই শহরের সন্ধান খুঁজে বার করেছিল। সেখানে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে, সামান্য কিছু পাথর ছাড়া সে বেশি কোনো জিনিস আনতে পারেনি সেখান থেকে। তার নিজের লেখা জাহাজের লগ বুকের (Log Book) কয়েকখানা পাতা আমি মালয় ভাষা থেকে নিজের সুবিধার জন্যে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে নিই সৌরাবায়াতে এক গরিব মালয় স্কুল মাস্টারকে ধরে। সেই অনুবাদের কাগজখানাও এই ব্যাগের মধ্যে আছে। তারপর ম্যাপখানা হস্তগত করে আমি নিজে অনেক খোঁজাখুঁজি করি–কিন্তু সুলু সমুদ্র ও ওদিকের বহুশত বসতিহীন ও বসতিযুক্ত ছোটো ও বড়ো দ্বীপ– তাদের প্রত্যেকটিতে ভীষণ জঙ্গল। ম্যাপেও যা আছে, তা খুব নিখুঁত নয় মোটের ওপর সে-দ্বীপ আমি বার করতে পারিনি। দেশের গ্রামে আমার ছেলে আছে, তাকে নিয়ে গিয়ে ম্যাপটা আর ব্যাগ দিও। এর মধ্যে আর একটা জিনিস আছে–আমার বোম্বেটে বন্ধু সেই প্রাচীন শহরে একটা জিনিস পায়। জিনিসটা একটা সিলমোহর বলেই মনে হয়।

একখানা গোটা পদ্মরাগ মণির ওপর সিলমোহরটা খোদাই করা। সেটা এর মধ্যে আছে। সেই মোহরের ওপর যে অদ্ভুত চিহ্নটি আঁকা আছে–আমার বিশ্বাস ছিল, সেটা একটা বড়ো হদিশ ওই প্রাচীন নগরীর রত্নভান্ডারের। তাই ওখানা আমি কবচের মতো গলায় ঝুলিয়ে বেড়িয়েছি এতদিন। কিন্তু আজ বুঝেছি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। উনিশ বছর আগে গ্রাম থেকে যখন চলে আসি, তখন আমার ছেলে ছিল দু-বছরের–আর আমার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিনি এই উনিশ বছরের মধ্যে। বেঁচে থাকলে আজ সে একুশ-বাইশ বছরের যুবক। তার হাতে এগুলো সব দিয়ে বলে দিও, বাপের ছেলে যদি হয়, সে যেন খুঁজে বার করে সেই নগরী, তার বাবা যা পারেনি। আর আমার কিছু বলবার নেই! ব্যাগটা নাও হাতে তুলে।

রোগী এই পর্যন্ত বলে ক্লান্তিতে চোখ বুজল। চীনা আড্ডাধারীর ইঙ্গিতে ও রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সুশীল বললে–তারপর?

বাবুজি, যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, নটরাজন বাঁচল কি মারা গেল সেদিকে কোনো খেয়াল করিনি। আমার মাথা তখন ঘুরছে। ব্যাগ খুলে দেখলাম কতকগুলো পুরোনো কাগজপত্র ও ম্যাপখানা ছাড়া আর কিছুই নেই। পদ্মরাগ মণিটা নেড়ে-চেড়ে দেখে কিছু বুঝলাম না–ওসব জিনিসের আমরা কী বুঝি বলুন! কিন্তু তখন আমার আর একটা বড়ো কথা মনে হয়েছে। নটরাজন যখন ওর গল্প করছিল, আমার মনে পড়ল সাত বছর আগের সেই ঘটনা। জাহাজে সেই কলেরা হওয়া, আমার জাহাজ থেকে পালানো এবং বন-জঙ্গলের মধ্যে সেই বিন্ধ্যমুনির দেশের মধ্যে গিয়ে পড়া, বুঝলেন না বাবুজি?

খুব বুঝেছি, বলে যাও।

আমার মনে হল, আমি সেখানে গিয়ে পড়েছিলাম ঘুরতে ঘুরতে। সে পুরোনো শহর আমি দেখেছি। নটরাজন যা বের করতে পারেনি, আমি সেখানে একটা গোটা দিন কাটিয়েছি। এই জায়গা সুলু সি-র ধারে, তাও আমি জানি। যদিও ঠিক বলতে পারব না হয়তো–কিন্তু দূর থেকে দেখলে বোধ হয় চিনব।

ত্রিবাঙ্কুরের সেই গাঁয়ে গেলে না?

লোকটা বললে, প্রথমে ওর লোভ হয়েছিল খুব। পদ্মরাগ মণিটার দাম যাচাই করে দেখা গেল প্রায় দেড় হাজার টাকা দাম সেটার। তা ছাড়া আরও লোভ হল, নটরাজনের ছেলেকে ম্যাপ দেবার কী দরকার? এই ম্যাপের সাহায্যে সে-ই তো জায়গাটা খুঁজে

বার করতে পারে। বিশেষ করে একবার যখন সেখানে সে গিয়েছিল। কিন্তু তিন-চার দিন ভাবার পরে ওর মনে হল মরবার আগে বিশ্বাস করে নটরাজন ওর হাতে জিনিসগুলো সঁপে দিয়েছে তার ছেলেকে দেবার জন্যে। এখন যদি না দেয়, তবে নটরাজনের ভূত ওর পেছনে লেগে থাকবে, হয়তো-বা মেরেও ফেলতে পারে। অতএব খানিকটা ইচ্ছা এবং খানিকটা অনিচ্ছাতে সেখানে যেতে সে বাধ্যই হল। বড়ো মজার ব্যাপার ঘটল কিন্তু সেখানে।

সুশীল বললে–কীরকম?

বাবুজি, অনেক কষ্ট করে বেউয়া কাপ্পিয়াম নদীর ধারে সেই কেটিউপ্পা গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছোলাম। দেখলাম নটরাজন মিথ্যে বলেনি, নদীটা একেবারে ওদের গ্রামের নীচে দিয়েই গিয়েছে বটে। নিজের পকেট থেকে যাওয়ার খরচ করলাম। গাঁয়ে গিয়ে যাকেই জিজ্ঞেস করি, কেউ নটরাজনের ছেলের খোঁজ দিতে পারে না। নটরাজনের কথাই অনেকের মনে নেই। দু একজন বুড়ো লোক বললে, নটরাজনকে তারা চিনত বটে– তবে অনেকদিন আগে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তার স্ত্রী-ছেলেকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে তারা জানে না।

তারপর?

মানে খানিকটা আনন্দ যে না হল তা নয়। ছেলেকে যদি সন্ধান না করতে পারি তবে আমার দোষ কী! তবুও একে ওকে জিজ্ঞেস করি। শেষকালে গাঁয়ের কাছারিতে কী ভেবে গিয়ে খোঁজ করলাম। তারা শুনে বললে, অনেকদিন আগে নটরাজনের জায়গা-জমি নীলাম করতে হয়েছিল খাজনা না দেওয়ার জন্যে। নীলামের নোটিশ তারা পাঠিয়েছিল ত্রিবেন্দ্রাম শহরে।

পেলে খুঁজে?–

ঠিকানা তো খুঁজে বার করলাম। ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ি, নারকেল গাছের বাগান সামনে। শহরের মধ্যে বাড়িটা নয়, শহর থেকে মাইল খানেক দূরে। অনেক ডাকাডাকির পর এক বুড়ি এসে দোর খুলে দিলে। মাথার চুল সব সাদা হয়েছে, অথচ মুখ দেখে খুব বয়স হয়েছে বলে মনে হয় না। বললে–কাকে চাও? আমি বললাম নটরাজনের ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বুড়ি আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে–ও নাম কোথায় শুনলে? ও নাম তো কেউ জানে না। আমি তখন সব কথা বুড়িকে বললাম। শুনে বুড়ি কেঁদে ফেললে। বললে–আমার ছেলেও আজ নিরুদ্দেশ, তার বাপের মতো সেও বেরিয়েছে– আজ তিন বছর হয়ে গেল। কোনো খবর পাইনি।

তুমি কী করলে?

এই কথা শুনে আমার বড়ো কষ্ট হল, বাবুজি। আমি সেখানে বুড়ির বাড়ি সাত-আটদিন রইলাম। তাকে মা বলে ডাকি। বুড়িও আমায় বড়ো যত্ন করতে লাগল। বুড়ি বড়ো গরিব ভাড়াটে ঘরে থাকে। তার ছেলে স্কুলে পড়ত। সে রাঁধুনিগিরি করে ছেলের পড়ার খরচ ও নিজেদের খরচ চালাত। এখনও সে নারকেল তেলের গুদামের শেঠজিদের বাড়ি রাঁধে। কোনোরকমে একটা পেট চলে যায়। বুড়িকে পদ্মরাগ মণিটা আমি দেখাইনি–

এত কষ্ট করে গিয়ে ওটার বেলা ফাঁকি দিলে?

ওই যে নটরাজন বলেছিল, পদ্মরাগ মণির গায়ে একটা আঁক-জোক আছে–যা হদিশ দেবে হীরে-জহরতের–ওই হল ওখানা না দেওয়ার গোড়ার কথা। ভাবলাম কী জানেন? ভাবলাম এই, নটরাজনের ছেলে না-পাত্তা–বুড়ির কাজ নয় ম্যাপ দেখে সুলু-সি যাওয়া আর সেই দ্বীপের মধ্যে লুকোনো শহর খুঁজে বার করা। যদি ওকে দিই ওগুলো এখানে পড়ে নষ্ট হবে। তার চেয়ে যদি আমি নিই, হয়তো চেষ্টা করলে একদিন-না-একদিন আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছেতেও পারি। যদি হীরে-জহরত পাই, বুড়িকে আমি ভালোভাবে খোরপোশ দিয়ে রাখব। কিন্তু যদি পদ্মরাগ মণিখানা দিয়ে দিই–তবে হদিশটা হাতছাড়া হয়ে গেল। বুড়ি এখুনি অপরকে মণি বিক্রি করবে। যে কিনবে, সে মণির গায়ে আঁকা সিলমোহরের কোনো মানেই বুঝবে না। লোহার সিন্দুকে আটকা থাকবে জিনিসটা। তাতে কারো কোনো উপকার নেই। কী বলেন আপনি?

তোমার যুক্তি মন্দ না। যদিও আমার মনে হয় জিনিসটা দেওয়াই তোমার উচিত ছিল। যাদের জিনিস, তারা সেটা নিয়ে যা খুশি করুক না কেন। তোমার ওপর শুধু পৌঁছে দেওয়ার ভার। সেটা তুমি রাখলে নিজের কাছে?

হাঁ বাবুজি। এই দেখুন আমার কাছেই আছে। আসুন ওই আলোর কাছে।

সুশীল আলোর নীচে গিয়ে বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর প্রসারিত করতলের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ল। মস্ত একখানা পাথর, একটু চ্যাপটা গড়নের, উজ্জ্বল সবুজ রঙের–তার ওপর খোদাই-কাজ করা।

সুশীল ওর হাত থেকে সিলমোহরটা নিয়ে দেখলে উলটে-পালটে। খোদাই-কাজ করা এত বড়ো পাথর সে কখনো দেখেনি। বড় সাইজের একটা কলার লজেন্সের মতো। সিলমোহরের মধ্যে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেল–বড়ো একটা ওঁকারের ওঁর ল্যাজ

জড়িয়ে জড়িয়ে পাকিয়েছে একটা বট গাছ কিংবা অন্য কোনো গাছকে। তারপর সে আরও ভালো করে চেয়ে দেখলে–আসলে ওটা ওঁকার নয়, যদিও সেইরকম দেখাচ্ছে বটে। কোনো নাগদেবতার মূর্তি হওয়াও বিচিত্র নয়। ত্রিভুজাকৃতি কী একটা আঁকা রয়েছে ছবির বাঁ-দিকে। কোনো নাম বা সন-তারিখ নেই।

লোকটা বললে–কিছু বুঝলেন বাবু?

না:, তবে হিন্দুর সঙ্গে এ জিনিসের সম্পর্ক আছে বলে মনে হল। দেড় হাজার টাকার জিনিসটা তুমি যে বড়ো বিক্রি করে ফেলনি এতদিন?

ওই যে নটরাজন বলেছিল এই খোদাই-করা আঁক-জোকের মধ্যে আসল মালের হদিশ পাওয়া যাবে– সেই লোভেই একে হাতছাড়া করে ফেলিনি।

নটরাজনের স্ত্রী কোথায়?

তাকে কেটিউপ্পা গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। মাসে মাসে টাকা পাঠাই। শহরে খরচ বেশি, গাঁয়ে খরচ কম। ঘর ভাড়া লাগে না। সেই সেদিনও পাঁচ টাকা ডাকে পাঠিয়েছি। এখন চাকরি নেই–নিজের পেটই চলে না।

কাগজপত্র আর ম্যাপগুলো?

ওই নটরাজনের স্ত্রী–তাকে আমি মা বলি– সেখানে তার কাছেই আছে। সঙ্গে নিয়ে বেড়াইনে, বড় দামি ও দরকারি জিনিস–আমার কাছে থাকলে হারিয়ে যেতে পারে। সে বুড়ি তার বেতের পেটরায় তুলে রেখে দিয়েছে, যখন দরকার হবে, নিয়ে আসব গিয়ে।

এসব আজ কত বছরের কথা হল?

বেশি দিনের নয়। আজ দু-বছর আগে আমি নটরাজনের গাঁয়ে গিয়ে বুড়ির সঙ্গে প্রথম দেখা করি।

তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোনো। এই মানিকখানা বিক্রি করে ফেলে টাকাটা নটরাজনের স্ত্রীকে দাওগে। তার জীবনটা একটু ভালোভাবে কাটবে। দেড় হাজার টাকা হাতে পেলে সে খুব খুশি হবে। তাদেরই জিনিস ধর্মত দেখতে গেলে, তোমার নিজের কাছে রাখা মানে চুরি করা।

কিন্তু বাবু, তাহলে হদিশ চলে গেল যে।

যাবে না। প্যারিস প্লাস্টারের ছাঁচে ওটা তুলে নিলেই চলে। ওই ছবিটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। মানিকখানা যার জিনিস, তাকে দাও ফিরিয়ে। তুমি যখন মা বলে ডাকো, তখন তার আশীর্বাদ তোমার বড়ো দরকার। মানিকখানা যদি বুড়ি বিক্রি করে, যে কিনবে সে ওর খোদাই ছবির কোনো মানে করতে পারবে না, তার কোনো কাজেই লাগবে না।

বেশ বাবুজি, আপনিই কাজটা করিয়ে দিন না?

কাল এটা সঙ্গে করে নিয়ে আমার সঙ্গে এখানে দেখা কোরো। আমার একটা জানাশুনো লোক আছে, সে এইসব কাজ করে–তাকে দিয়ে করিয়ে দেব।

রাত হয়ে গিয়েছিল। সুশীল মাঠ থেকে ফিরতে ফিরতে কত কথাই ভাবলে। তার মাথার মধ্যে যেন কেমন করছে। এ যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনির মতো অদ্‌ভুত! এমনভাবে গড়ের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে একজন মুসলমান লশকরের সঙ্গে দেখা হবে– সে তাকে এমন একটি আজগুবি গল্প বলে যাবে–এ কখনো সে ভেবেছিল? গল্পটা আগাগোড়া গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেও পারত সে, যদি ওই চুনির সিলমোহরখানা সে না দেখত নিজের চোখে।

লোকটার গল্প যে সত্যি, তা ওই পাথরখানা থেকে বোঝা যাচ্ছে। সন তারিখ ও জায়গা মিলিয়ে এমনভাবে সে গল্প বলে গেল–যা অবিশ্বাস করা শক্ত। সুশীল ওকে শেষের দিকে। যে প্রশ্নটা করেছিল, অর্থাৎ কতদিন আগে বুড়ির সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল, সেটা শুধু সময় সম্বন্ধে তাকে জেরা করা মাত্র।

সুশীল বাড়ি গিয়ে সনৎকে বললে–এই কলকাতা শহরেই অনেক মজা ঘটে যায় দেখছি।

সনৎ বললে–কী দাদা?

সে একটা অদ্‌ভুত গল্প। যদি বলবার দরকার বুঝি তবে বলব—

পরদিন গড়ের মাঠে আবার সে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে রইল। একটু পরে জামাতুল্লা খালাসি এসে ওর পাশে নিঃশব্দে বসে পড়ল। বললে–আমার কথা ভাবলেন বাবুজি?

চলো আমার সঙ্গে। একটা ছাঁচ তোমাকে করিয়ে দিই। এনেছ ওটা?

হাঁ বাবুজি। দেখুন, আমি ভিক্ষে করে খাচ্ছি আজ দু-মাস, তবুও এত বড়ো দামি পাথরটা বিক্রি করিনি শুধু বড়ো একটা লাভের আশায়। কিন্তু যত দিন যাচ্চে, তত আমার মনে হচ্চে নসিব আমার খারাপ, নইলে সেই জায়গায় গিয়েও তো কিছু করতে–

জামাতুল্লা, তুমি লেখাপড়া-জানা লোক না হলেও খুব বুদ্ধি আছে। একা তুমি কিছু করতে পারবে না তা বেশ বোঝো। এ কাজে টাকা চাই, লোক চাই, জাহাজ চাই। অনেক টাকার খেলা সেসব। তোমার অত টাকা নেই। মিছে কেন নটরাজনের স্ত্রীর পাওনা জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত করবে?

২. প্যারিস প্লাস্টার

দু-একদিনের মধ্যে প্যারিস প্লাস্টারের ছাঁচটা হয়ে গেল। সুশীল প্রাচীন ধনী বংশের সন্তান, ওর যে ছাঁচ গড়িয়ে দিলে, সে ভাবলে ওদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি এটা। ফেরত দেওয়ার সময় সে বললে–এটা আমার এক বন্ধুকে একবার দেখতে দেবে?

কেন বল তো?

আমার সে বন্ধু মিউজিয়ামে কাজ করে। পন্ডিত লোক। যদি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এটা কিনে নেওয়া হয় তাই বলছি।

তাকে তোমার স্টুডিয়োতে কাল নিয়ে এসো।

পরদিন জামাতুল্লাকে নিয়ে সুশীল বন্ধুর স্টুডিয়োতে গিয়ে দেখলে একটি সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক সেখানে বসে আছেন।

বন্ধুটি বলে উঠল–এই যে এসো সুশীল, ইনি এসে অনেকক্ষণ বসে আছেন–আলাপ করিয়ে দিই–ডা. রজনীকান্ত বসু, এম. এ., পিএইচ. ডি.–মিউজিয়ামে সম্প্রতি চাকুরিতে ঢুকেছেন।

কিছুক্ষণ পরে ডা. বসু পদ্মরাগের সিলমোহরের ওপর ঝুঁকে পড়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠে বললেন–এ জিনিসটা আপনি পেলেন কোথায়?

সুশীলের আর্টিস্ট বন্ধু বললে–ওটা ওদের বংশের জিনিস। ওরা পল্লিগ্রামের প্রাচীন ধনী বংশ।

ডা. বসু সন্দিগ্ধ মুখে বললেন–কিন্তু এ তো তা নয়! এ যে বহু পুরোনো জিনিস! এ আপনারা পেয়েছিলেন কোথায় তার ইতিহাস কিছু জানেন? যদি বলতে বাধা না থাকে–

সুশীল বললে–না ডা. বসু, আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না। আপনি কী আন্দাজ করছেন।

ডা. বসু বললে–দেখুন, সিলমোহরের ওপর এ চিহ্ন আমি নিজে কখনো দেখিনি–তবে এই ধরনের পাথরের ওপর সিলমোহর ওঁকারভাটে পাওয়া গিয়েছে। ফরাসি ইন্দোচীনের জঙ্গলের মধ্যে বহু পুরোনো নগরের ধ্বংসস্তূপে। এর সময় নির্দিষ্ট হয়েছে মোটামুটি খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী। আমাদের মিউজিয়ামেও আছে–কাল যাবেন,

দেখাব। কিন্তু আপনার এটা আরও পুরোনো, আমি একে নির্ভয়ে নবম শতাব্দীতে ফেলে দিতে পারি–কিংবা তারও আগে।

সুশীল বললে–আপনার তাই মনে হয়?

নিশ্চয়ই। নইলে বলতাম না। আর সেই জন্যেই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনাদের পূর্বপুরুষে এটা পেলেন কী করে? এ হল সমুদ্রপারের জিনিস। বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের আম গাছের ছায়ায় শান্ত ও নিরীহ জিনিস নিয়ে কারবার–কিন্তু এ সিলমোহরের পেছনে রয়েছে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার দুর্দান্ত সাহস, দুর্জয় বিক্রম, যুদ্ধ, রক্তপাত–ভারতবাসী যেদিন সমুদ্রের ওপারে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেইসব দিনের ইতিহাস এ সিলমোহরের সঙ্গে জড়ানো। তাই বলছি, এটা আপনারা পেলেন কী করে?

.

ওখান থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে সুশীলের মনে টাকার স্বপ্ন ছিল না।

ছিল যে সুদূরের, দুঃসাহসিক অভিযানের স্বপ্ন–জামাতুল্লা খালাসির অত বড়ো পদ্মরাগ মণিখানার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

সে এমন এক দিনের স্বপ্ন–যা প্রত্যেক ভারতবাসীর আত্মসম্মানকে জাগ্রত করে, তরুণদের প্রাণে নতুন আশা, উৎসাহ ও আনন্দের সংবাদ আনে বয়ে–

তবু তা সুশীলের মনে যে ছবি জাগালে তা আদৌ স্পষ্ট নয়–সবই আবছায়া, সবই ধোঁয়া ধোঁয়া। সুশীল ইতিহাসের ছাত্র নয়। ডা. বসুর শেষ কথা ক-টির সঙ্গে যেন এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক শক্তি মেশানো ছিল–তার চোখের সামনে প্রাচীনকালের সুদীর্ঘ অলিন্দ বেয়ে তলোয়ার হাতে বর্মে চর্মে সুসজ্জিত বীরের দল সারি সারি চলেছে, মৃত্যুকে তারা ভয় করে না–অজানা সমুদ্রপথে তাদের বিজয় অভিযান নব উপনিবেশের ইতিহাস সৃষ্টি করে ভাবীকালের অসহায় ও অকর্মণ্য সন্তানদের শিরায় শিরায় নতুন রক্তের আলোড়ন এনে দেয়।

কোথায় সে পড়ে আছে পাড়াগাঁয়ে, পুরোনো জমিদার-ঘরের বিলাসপুষ্ট আয়েসি ছেলেটি সেজে–তাদেরই পূর্বপুরুষ একদিন যে অসি হাতে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল–তাদেরই স্বজাতি, স্বদেশবাসী–আর সে থাকবে দিব্যি আরামে তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে, তেলে জলে, দাদখানি চালের ভাত আর মাছের ঝোলে কোনোরকমে পৈতৃক বাঙালি প্রাণটুকু বজায় রেখে চলবে টায় টায়।

চিরকাল হয়তো এমনি কেটে যাবে তার।

প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করে, পুরোনো চন্ডীমন্ডপে বসে তামাক টেনে আর পালপার্বণে গ্রাম্য লোকজনের পাতে দই মোণ্ডা দিয়ে হাততালি অর্জন করবার প্রাণপণ চেষ্টায় মশগুল হয়ে।

তারপর আছে মামলা, মোকদ্দমার তদারক করতে কোর্টে ছুটোছুটি–ডিক্রি, নালিশ, কিস্তিবন্দি, সইমোহরের নকল, সমন জারি–উঃ! ভাবলে তার গা কেমন করে। প্রাচীন ধনী বংশের লাল খেরো-বাঁধানো রোকড় ও খতিয়ানের চাপে সে নিজের যৌবন ও জীবনকে একদম পিষে মেরে ফেলে শেষের দিকে যখন মহকুমার হাসপাতালে একটি মাত্র রোগী থাকবার স্থানের টাকা জেলাবোর্ডের হাতে দেবে স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতি-রক্ষা কল্পে–তখন হয়তো সে পাবে রায়সাহেব বা রায়বাহাদুর খেতাব।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভাববে, এই তো জীবনের পরম সার্থকতা সে পেয়ে গেছে।

না দেখবে দুনিয়া–না দেখবে জীবন, টুলিপরা বলদের মতো ঘানিগাছের চারিধারে ঘুরেই জীবন কাটাবে।

রাত্রে সে সনৎকে ডেকে বললে–সনৎ, তোর সাহস আছে?

কেন দাদা?

আমি যদি বিদেশে বেরোই, আমার সঙ্গে যাবি?

এখুনি–যদি নিয়ে যাও!

অনেক দূরে হলেও?

যেখানে বল।

বাড়ির জন্যে মন কেমন করবে না?

আমি পুরুষ মানুষ না দাদা? ও কথাই ওঠে না!

আমি এমনি জিজ্ঞেস করছি

পরদিন সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে পড়ল পুরোনো দিনের বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস। যেসব কথা সে জানত না, কোনোদিন শোনেনি–ডা. বসুর কথায় তার ইচ্ছে গেল সেগুলো জানবার ও পড়বার।

বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনি, চম্পা রাজ্যের কথা–সুদূর সমুদ্রপারের ভারতীয় উপনিবেশ চম্পা। ভারতবাসী অসির তীক্ষ্ণাগ্রভাগ দিয়ে যে দেশের মাটি পাথরের গায়ে নাগরাজ বাসুকী, শিব-পার্বতী ও বিষ্ণুমূর্তি অমর করে রেখেছে।

জামাতুল্লা খালাসিকে সে এক-শো বার ধন্যবাদ জানালো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে পড়তে পড়তে।

সে তো এক পাড়াগাঁয়ে অলস জীবনযাপন করছিল—

কোনোদিন এসব কথা সে জানতেও পারত না–এত বড়ো ছবি তার মনে কোনোদিন জাগতও না–যদি দৈবক্রমে জামাতুল্লা খালাসি সেদিন তার পাশে এসে বসে দেশলাই না চাইত।

তুচ্ছ এক পয়সার দেশলাই।

পড়ার টেবিলে বসে বসেই সুশীলের হাসি পেল কথাটা ভেবে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে বার হয়েই জামাতুল্লা খালাসির সঙ্গে দেখা করতে গেল।

মাঠের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে আছে। সুশীলকে দেখে সে বললে–আসুন বাবু, কাল রাতে এক কান্ড হয়ে গেছে! আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে–

সুশীল বাধা দিয়ে বললে–কী–কী?

জামাতুল্লা বললে–সে এক আজগুবি কান্ড বাবু—

কীরকম ব্যাপার?

আপনার সেই বন্ধুর বাড়ি থেকে পাথরখানা নিয়ে কাল ফিরছি বাবু, মেটেবুরুজের কাছে ছোটোমোল্লাখালি বলে যে বস্তি ওই বস্তির কাছে আমার এক দোস্ত থাকে। ভাবলাম, চা খেয়ে যাই। সেখানে একেবারে মানুষ নেই–ফাঁকা মাঠ, সিকিমাইল দূরে ছোটোমোল্লাখালি বস্তি। হঠাৎ বাবু আমার মনে হল আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, কে যেন আমার গলা দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে–আমি

তো চেঁচিয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম–কিন্তু পড়ে গেলাম চিৎপাত হয়ে মাঠের মধ্যে–পেছনে সে-সময় পায়ের শব্দ শুনলাম যেন–

সুশীল ব্যস্ত হয়ে বললে–পাথরখানা আছে তো?

শুনুন বাবু, তারপর। আমি এমন কান্ড কখনো দেখিনি। চিৎপাত হয়ে পড়ে আর জ্ঞান নেই। যখন জ্ঞান হল তখন দেখি আমার চারিপাশে দু-তিন জন লোক দাঁড়িয়ে, তারা কেউ পানি এনে আমার চোখে-মুখে দিচ্ছে, কেউ গামছা নেড়ে বাতাস করছে। আমার দোস্ত-এর নাম বলতে তারা আমায় ছোটোমোল্লাখালি নিয়ে গেল তার বাড়িতে। সেখানে গিয়ে যখন আমার হুঁশ বেশ ভালো ফিরে এল, আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখি পাথরখানা নেই।

বল কী? নেই! গেল সেখানা!

শুনুন বাবু আজগুবি কান্ড! পাথর নেই দেখে তো আমি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। দোস্তের বাড়ি তো শোরগোল পড়ে গেল। কত লোক দেখতে এল–আমার দোস্ত কতবার মুখে-চোখে পানি দিয়ে ডাক্তার ডেকে আমায় চাঙ্গা করলে। আমি সেই রাত্রেই বাড়ি চলে গেলাম–

তারপর?

বাবু আপনি বলুন একটা কথা। আমি কাল আপনার দোস্তের কাছে দেখাতে গিয়েছিলাম কী নিয়ে? যে ছাঁচ তৈরি হয়েছিল তাই নিয়ে–না আসল পাথরখানা নিয়ে? আপনার ওই যে দোস্ত খুব এলেমদার লোক, তার কাছে?

ও, ডা. বসুর কাছে তুমি তো আসল পাথরখানা নিয়ে গেছলে। ছাঁচখানা নিয়ে যাইনি ঠিক তো? কিন্তু বাবু বাড়ি ফিরে দেখি আসল পাথরখানা পকেটে রয়েছে, ছাঁচখানা নেই।

সুশীল হো-হো করে হেসে বললে–এ কোনো আজগুবি কান্ড হল না জামাতুল্লা। তুমি দু-খানাই নিয়ে গেছলে। যে তোমার গলা টিপেছিল সে ছাঁচখানাকে ভুল করে নিয়ে গেছে– আসলখানা তোমার পকেটেই রয়ে গিয়েছিল। কোন পকেটে কোনটা রেখেছিলে মনে আছে?

বাবু আমি ছাঁচটা নিয়েই যাইনি–

আমি বলছি শোনো। তুমি ভুলে দুটোই নিয়ে গেছলে। কিন্তু এ থেকে আমাদের সাবধান হতে হবে। কেউ আমাদের পাথরের খবর পেয়েছে–কলকাতা গুণ্ডা বদমাইশের জায়গা আমরা ক-দিন ধরে এখানে পাথরের কথা বলেছি, তত সাবধান হইনি। এখানেও শুনতে পারে, সেদিন ডা. বসুর ওখানে দুটো আরদালি দাঁড়িয়েছিল–আমার সন্দেহ হয় তাদের মধ্যে কেউ শুনতে পারে। যাক, ভালোই হয়েছে যে আসলখানা চুরি যায়নি! আজ তোমার সঙ্গে নেই তো সেখানা?

না বাবু। আমি কি আর তেমনি উজবুক?

লোক লেগেছে আমাদের পেছনে। খুব সাবধানে চলাফেরা করবে।

জামাতুল্লা হেসে বললে–বাবু, লোক লেগে আমায় হঠাৎ কিছু করতে পারবে না। সারাঙ্গুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি–কত বদমাইশ লোকের সঙ্গে কতবার কারবার করেছি। এই হাতদুটো যে দেখছেন–এ দুটো ঠিক থাকলে এর সামনে কেউ এগোতে পারবে না জানবেন খোদার দোওয়ায়।

সুশীল একবার চারদিকে চেয়ে দেখলে–কোনোদিকে কোনো লোক নেই। সঙ্গীকে চুপিচুপি বললে–এসব কথা এখন নয়। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?

কোথায় বাবুজি?

আমার বাসায়। সেখানে ঘরের মধ্যে বসে সব কথা হবে এখন।

জামাতুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে সুশীল তাদের বাসায় এল। আসার পথে কোনো কিছু অঘটন ঘটেনি দেখে সুশীলের মন থেকে ভয় ও বিপদাশঙ্কা অনেকখানিই চলে গেল। জামাতুল্লাকে কিছু খেতে দিয়ে ও তার জন্যে বাইরের ঘরের কোণে বিছানা করে দিলে।

জামাতুল্লা বললে–বাবুজি, বিছানা কেন?

রাত্রে এখানে তোমায় রাখব। যেতে দেব না মেটেবুরুজে। সাবধানের মার নেই। খিদিরপুরের মাঠ থেকে মেটেবুরুজ পর্যন্ত জায়গা বড্ড নির্জন–গুণ্ডা বদমাইশদের আড্ডা। রাত্রে সে-পথে গেলে বিপদ আছে। তোমার যত সাহসই থাকুক–রাত্রে যাওয়া হবে না।

সুশীলের এ সতর্কতার জন্যে জামাতুল্লাকে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকতে হয়েছিল।

রাত্রে আহারাদির পরে সুশীল জামাতুল্লাকে বললে–আমার মতলব তোমাকে বলব বলেই তোমায় ডেকেছি। আমার মনে হয়েছে আমরা যে করেই হোক–চলো সেই বনের মধ্যে প্রাচীন নগরের সন্ধানে বেরোই। টাকাকড়ির সন্ধান আমি করছি নে–পাই ভালো, তা আমি একা নেব না–নটরাজনের স্ত্রীর শেষ দিনগুলো যাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটে তার ব্যবস্থা করব তা দিয়ে। তারপরে তুমি আছ, আমি আছি। ভগবানের আশীর্বাদে আমার ঘরে খাবার ভাবনা নেই।

জামাতুল্লা খালাসি ঘাড় নেড়ে বললে–সে আমি আগেই জানি বাবু–আপনি রইস আদমি –মানুষ দেখেই চিনতে পারি। নইলে আপনাকে এত বিশ্বাস করতাম না। বড়ো ঘরানা আপনারা, আপনাদের নজর হবে বড়ো।

তা ছাড়া কী জান জামাতুল্লা? এই বয়স হচ্ছে বিদেশ বেড়ানোর সময়। চিরকাল বাড়ি বসে থাকব যদি, তবে দুনিয়া দেখব কবে? ... তোমার সাহস আছে আমায় সেখানে নিয়ে যাবার তো?

এ বাবুজি সাহসের কথা নয়। জাহাজ চালানো বিদ্যের কথা–কৌশলের কথা। সিঙ্গাপুরে আমার এক দোস্ত আছে তাকে খুঁজে বার করতে হবে। সে সুলু সি-তে জাহাজ চালিয়েছে অনেক দিন–আপনার কাছে ছিপাব না, বোম্বেটের কাজ করত সে। এখন বড্ড কড়া শাসন, ওলন্দাজ সরকার আর আমাদের ইংরেজ সরকারের। মানোয়ারি জাহাজ সর্বদা ঘুরছে। বোম্বেটে জাহাজ ধরতে পারলেই ধরে নিয়ে আসবে–আর গুলি করবে। সেজন্যে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে দোকান করে বসে আছে সিঙ্গাপুরে। তাকে সঙ্গে নিতে হবে।

তাহলে কীরকম ব্যবস্থা করবে যাবার?

আপনি টাকা কত নিতে পারবেন বলুন।

শ-পাঁচেক। তার বেশি এক পয়সা নয়।

তাও নেবেন না। আপনি আমার দোস্ত–দু-শো নিয়ে চলুন। আমি পাথর বিক্রি করে ফেলি–সেই টাকায় চালাব।

সে টাকা তোমায় আমি নিতে দেব না জামাতুল্লা। নটরাজনের স্ত্রীকে বঞ্চিত করে সে-পাথর নিয়ে আমাদের ফল ভালো হবে না। নটরাজন স্বর্গ থেকে দেখবে আর অভিশাপ দেবে।

এই জন্যেই তো বলি, রইস আদমির বুদ্ধি আর আমাদের বুদ্ধি! আপনি যা বলবেন বাবুজি।

অনেক রাত হয়েছিল। জামাতুল্লার বিশ্রামের বন্দোবস্ত করে দিয়ে সুশীল নিজে শোবার জন্যে চলে গেল বটে–কিন্তু তার সারারাত ঘুম এল না চোখে। এবার কী ক্ষণে সে বাড়ি থেকে বার হয়েছিল! সাগরপারের যাত্রী হয়ে যদি সেই অজানা দ্বীপে অরণ্যের মধ্যে প্রাচীন যুগের হিন্দু-কীর্তি শুধু চোখের দেখা দেখে আসতে পারে–তবেই সে জীবন সার্থক বিবেচনা করবে। চম্পারাজ্যের মতো সেখানেও আর এক হিন্দু উপনিবেশ ছিল নিশ্চয়ই মহাকালের চক্রনেমির আবর্তনে অরণ্য গ্রাস করেছে সে নগরী–তবুও ভারতের সন্তান সে প্রাচীন যুগের সেই পুণ্যভূমির পবিত্র ধূলি স্পর্শ করে সে ধন্য হতে চায়।

অর্থের জন্যে সে যাচ্ছে না।

পরদিন সকালে উঠে সুশীল জামাতুল্লাকে চা ও খাবার খেতে দিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে বসেছে–এমন সময় কাগজওয়ালা খবরের কাগজ দিয়ে গেল; সুশীল কাগজ খুলে সংবাদগুলোর ওপর সাধারণভাবে চোখ বুলোতে গিয়ে হঠাৎ উত্তেজিত সুরে বলে উঠল– জামাতুল্লা, আরে, তোমাদের মেটেবুরুজে খুন! ...

জামাতুল্লা চা খেতে খেতে চমকে উঠে বললে–কোথায় বাবু, কোথায়?

দু-নম্বর মফিজুল সর্দারের লেন, একটা কুঠুরিতে নূর মহম্মদ নামে একটা লোককে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে–

সুশীল কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখলে জামাতুল্লা তালপাতার মতো কাঁপছে–অতি কষ্টে সে সুশীলকে জিজ্ঞেস করলে–কী নাম লোকটির বাবুজি?

নূর মহম্মদ–

জামাতুল্লা চা ফেলে উঠে এসে সুশীলের হাত ধরে বললে–আপনি আমার সবচেয়ে বড়ো দোস্ত–কাল এখানে রেখে আপনি আমার জান বাঁচিয়েছেন! নূর মোহম্মদ আমার ঘরেই থাকে। এক বিছানাতে দু-জনে শুই–কাল আমি থাকলে আমাকেই মারত, আমি ভেবে ভুল করে ও বেচারিকে খুন করে গিয়েছে–

সুশীল বলে–তুমি এখুনি বাড়ি যাও–সেই জিনিসটা–

বাবু, সে আমি অন্য জায়গায় রেখেছি–সেখান থেকে কেউ সেটা বের করতে পারবে না।

সুশীল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে–তবুও একবার যাও—

সেটা নিয়ে বাবুজি আপনাদের বাড়িতে রেখে দিন আপনি–মেহেরবানি করে যদি রেখে দেন!

নিশ্চয়ই রাখব। তুমি একা যেও না–চলো আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। আমার ভাই সনৎকে সঙ্গে নেব।

পাথরখানা এনেই সুশীল কয়েকদিনের মধ্যে তার আর-একখানা ছাঁচ করিয়ে নিয়ে সেখানা ব্যাংকে জমা দিয়ে এল। ওসব জিনিস সঙ্গে রাখলেই যত গোলমাল।

কিন্তু ব্যাংকে রাখবার কয়েকদিন পরেও ঘটে গেল এক বিপদ।

সুশীল তখন হাজার দুই টাকার ব্যবস্থা একরকম করে ফেলেছে। তার কাকাই টাকাটা তাকে দেবেন–তবে সে বলেছে ব্যাবসার জন্যেই ওটা দরকার–বিদেশে যাওয়ার কথা শুনলে কেউ উৎসাহ দিত না। ওর সঙ্গে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে রাজি, সনৎ একথা জানিয়েছে।

সুশীল বৌবাজার দিয়ে গিয়ে জামাতুল্লাকে ট্রামে দিয়ে এল। ট্রাম পরবর্তী থামবার জায়গায় যাবার পূর্বেই ট্রামে এক শোরগোল উঠল।

জামাতুল্লা ট্রামের বেঞ্চিতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের একজন লোক নেমে গেল–নেমে যাবার সময় একবার যেন তার হাতখানা জামাতুল্লার পিঠের দিকে ঠেকল..অন্তত জামাতুল্লার তাই মনে হল। পরক্ষণেই জামাতুল্লা রক্তাক্ত দেহে চিৎপাত ট্রামের মেঝেতে!

লোকজন হইহই–পুলিশ! পুলিশ! সবাই মিলে ওকে ধরাধরি করে নামিয়ে ফেললে।

শেষে দেখা গেল ওর বিশেষ কিছু লাগেনি এবারও। একখানা ধারালো ছুরি দিয়ে বোধ হয় আততায়ী কোমরের থলে কাটতে চেষ্টা করেছিল। ছুরিখানা দৈবাৎ তলপেটের পাশের দিকে লেগে খানিকটা অগভীর রেখা সৃষ্টি করে লম্বালম্বিভাবে কেটে গিয়েছে।

এই ঘটনার ঠিক সাতদিন পরে সুশীল, সনৎ ও জামাতুল্লা তিনজনে একখানা রেঙ্গুনগামী জাহাজে চড়ে বসল–আপাতত সিঙ্গাপুর এবং সেখান থেকে ব্যাটেভিয়া যাবে এই হল উদ্দেশ্য ওঁদের।

মাস দুই পরের কথা। সকাল বেলা।

সুশীল সিঙ্গাপুরের ভারতীয় পাড়ায় একটি ছোটো শিখ হোটেলের একটা ঘরে বসে সনৎকে বলছিল–আমরা এখানে এসে ভালো করলাম কী মন্দ করলাম এখনওবুঝিনি সনৎ। জামাতুল্লার বোম্বেটে বন্ধু তো দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির লোক–ও হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। ওকে কি খুব বিশ্বাস করা উচিত হল?

বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী দাদা? ও ছাড়া সুলু সমুদ্রে জাহাজ চালাবে কে? তবে আমার মনে হয় যখন আমাদের কাছে এমন কোনো মূল্যবান জিনিস নেই–তখনসে অনর্থক মানুষ খুনের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে যাবে কেন?

এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। জামাতুল্লা তার বোম্বেটে বন্ধু মি. ইয়ার হোসেনকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ইয়ার হোসেন ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে একটা চুল-ছাঁটা দোকান করে ভাড়াটে চীনে নাপিত দিয়ে চুল ছাঁটায়-রোজগার মন্দ হয় না। বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর বয়স হবে, রোগা চেহারা–চোখের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ভালোমানুষ ও নিরীহ ধরনের বলে মনে হয়–পরনে সাহেবি পোশাক। লোকটা ভারতীয় নয়, মালয়ও নয়–কোন দেশের লোক তা কখনো বলেনি। তবে তার কথাবার্তা থেকে মনে হয় ভারতের ওপর টানটা তার বেশি। কথাবার্তা বলে ইংরেজিতে, নয়তো মালয় ভাষায়। তার ভাঙা ইংরেজি জামাতুল্লা বেশ বোঝে।

এ ধরনের লোকের সঙ্গে কখনো সুশীল বা সনৎ-এর পরিচয় ঘটেনি ইতিপূর্বে। বাইরে মোটামুটি ভদ্রলোক, এমনকী বেশ নিরীহ প্রকৃতির প্রৌঢ় ভদ্রলোক–কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইয়ার হোসেন দুর্দান্ত দস্যু। মুহূর্তের মনোমালিন্যের ফলে যারা বন্ধুর বুকে অতর্কিতে তীক্ষ্ণধার কিরিচ বসিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না–এ সেই-জাতীয় লোক।

ইয়ার হোসেন ঘরে ঢুকে বললে–বসে আছেন? আমায় আর দু-শো টাকা দিতে হবে–দরকার রয়েছে।

সুশীল জামাতুল্লার মুখের দিকে চাইলে অতি অল্পক্ষণের জন্যে। জামাতুল্লা চোখের ইঙ্গিতে তাকে বলে দিলে ইয়ার হোসেনকে যেন সে প্রত্যাখ্যান না করে।

কত টাকা বললেন মি. হোসেন?

দু-শো কী আড়াইশো—

বেশ, নেবেন। সেদিন নিয়েছেন এক-শো—

ইয়ার হোসেন যেন খানিকটা উদ্ধত সুরে বললে–নিয়েছি তো কী হবে? তোড়জোড় করতেই সব টাকা যাচ্ছে–

জাহাজের কী হল? চার্টার করবেন?

জাহাজ চার্টার করবার টাকা কোথায়? কিন্তু আচ্ছা, একটা কথা বলি। আপনারা সে বিস্মমুনির দেশে যেতে চাইছেন কেন? টাকা-কড়ি হীরে-জহরত সেখানে সত্যি আছে?

কী করে বলি সাহেব! তবে, তোমার কাছে লুকোব না। খুব বড়ো রত্নভান্ডার সেখানে লুকোনো আছে এই আমাদের বিশ্বাস। ওই মণির ওপর আঁক-জোঁক আছে–ওটাই তার হদিশ–অন্তত নটরাজন তাই বলেছিল।

আমি চেষ্টা করে দেখব–কিন্তু আমার ভাগ ঠিক তিন ভাগের এক ভাগ চাই। ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলেই বিপদ ঘটবে। এই হাতে অনেক মানুষ খুন করেছি, সে-কথা কে না জানে? মানুষ মারাও যা, আমার কাছে পাখি মারাও তা।

সুশীলের গা যেন শিউরে উঠল। কাজের খাতিরে এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের সঙ্গে আজ তাকে মিশতে হচ্ছে–ভাগ্য কী জানি কোন পথ তাকে নির্দেশ করছে! মুখে বললে–না সাহেব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো–ফাঁকে তুমি পড়বে না।

ইয়ার হোসেন বললে–একটা গল্প বলি শোনো তবে। একবার আমার জাহাজে ছ সাতজন মাল্লা মদ খেয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। তাদের দলে একজন সর্দার ছিল, সে এসে আমায় জানালে, এই এই শর্তে আমি রাজি না হলে তারা আমার হাত-পা বাঁধবে–মেরে ফেলতেও পারে। আমি ওদের সান্ত্বনা দিয়ে শর্তে সই করে দিলাম। তারপর ইঞ্জিন রুমের বড়ো কর্মচারীকে ডেকে বললাম–জাহাজে কয়লা দিয়েই স্টিম বন্ধ করে ফার্নেসের মুখ খুলে রাখবে।

ইঞ্জিনিয়ার বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে–কেন কাপ্তেন সাহেব–এ তো বড়ো বিপজ্জনক ব্যাপার–সেই ভীষণ উত্তাপে ফার্নেসের মুখ খুলে রাখব?

সে বেচারি আমার মতলব কিছু বুঝলে না। আমি সেই বিদ্রোহী সর্দারকে আর তার চারজন অনুচরকে বললাম ফার্নেসে কয়লা দিতে। এদিকে ইঞ্জিন-রুমে টেলিগ্রাফে ইঞ্জিনিয়ারকে পুরোদমে স্টিম দিতে বলেই ওরা ঘরে ঢুকবার সঙ্গেসঙ্গে পুলি ঘুরিয়ে

জাহাজ প্রায় পঁচিশ ডিগ্রি কোণ করে স্টারবোর্ডের দিকে কাত করে ফেললাম। টাল সামলাতে না পেরে ওরা হঠাৎ গিয়ে পড়ল খোলা ফার্নেসের মুখে। লোক ঠিক করা ছিল, তক্ষুনি তারা ওদের ফার্নেসের আগুনে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়ে ফার্নেসের দরজা ঘটাং করে বন্ধ করে দিলে।

সনৎ ও সুশীল রুদ্ধনিশ্বাসে বললে–তারপর?

তারপর? তারপর দু-দিন পরে কতকগুলি আধপোড়া হাড় পোড়া কয়লার ছাইয়ের সঙ্গে ফার্নেস-সাফ-করা কুলি সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে। মিউটিনি শেষ হয়ে গেল।

কেউ টের পেলে না?

সবগুলো বদমাইশ যখন ও পথে গেল–তখন বাকিগুলি আপনা আপনিই চুপ করে গেল। ভালোমানুষির দিন চলে গিয়েছে জানবেন। নিষ্ঠুর হতে হবে, নির্মম হতে হবে–তবে মানুষের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে পারবেন।

সুশীল বুঝল না এমন নিরীহ ভালোমানুষটির আড়ালে কী করে এমন দৃঢ় ও নির্মম চরিত্র লুকোনো থাকতে পারে।

আর একটা কথা–অস্ত্রশস্ত্র কেমন আছে আপনাদের?

কিছু না, একটি করে অটোম্যাটিক আছে দু-জনের–তার কার্টিজ নেই।

রাইফেল নেই?

ভারত থেকে রাইফেল কেনা? মি. হোসেন, এবার আপনি হাসালেন।

ইয়ার হোসেন দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা বড়ো রিভলবার নিয়ে এসে সুশীলের হাতে দিয়ে বললে–পছন্দ হয়?

ওঃ, এ তো চমৎকার জিনিস।

এই কিনব তিনটি তিনজনের, আর একটা পুরোনো মেশিনগান—

মেশিনগান কী হবে!

অনেক দরকার আছে।

সুশীল ও সনৎ দু-জনেই দেখলে সে অনেকরকম জানে-শোনে। জাহাজ চালানোর যন্ত্রাদি কিনবার সময়–তার যে কিছু কিছু বিজ্ঞানের জ্ঞানও আছে–এ পরিচয়ও পাওয়া গেল। চালচলনে, ধরনধারণে–সে সর্বদাই মনে করিয়ে দেয় যে সে সাধারণ নয়।

সুশীল জামাতুল্লাকে বললে–তুমি বলেছিলে দু-শো টাকা হলেই হবে–তো এখন দেখছি পাঁচশো টাকাই মি. হোসেন নিয়ে নিলে নানা ছুতো করে; হাতে কিন্তু এক পয়সাও রইল না–

কোনো ভয় নেই বাবুজি, আমি যখন আছি। ও তেমন লোক নয়।

লোক নয় কীরকম? ভয়ানক লোক, আমরা বুঝেছি। ও দরকার মনে করলে তোমার মতো পুরোনো বন্ধুর গলা কাটতে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

বাবুজি দেখছি ভয় পেয়ে গিয়েছেন।

তা একটু পেতে হয়েছে। টাকাটা ও মেরে দেবে না তো? তুমি হুশিয়ার হয়ে থাকবে ওর পেছনে।

বাবুজি আমি হাজার পেছনে থেকেও কিছু করতে পারব না–ও যদি ইচ্ছে করে তবে সিঙ্গাপুর থেকে আজই পালিয়ে যেতে পারে–কেউ পাত্তাই পাবে না। ইয়ার হোসেন ছাঁচটার কথা জিজ্ঞেস করছিল–

তুমি কী বললে?

বললাম, বাবুর কাছে আছে।

মতলব কী?

না বাবু খারাপ কিছু নয়–ও একবার দেখতে চায়।

ওঃ, ভাগ্যিস আসল পদ্মরাগখানা ব্যাংকে জমা দিয়ে এসেছিলাম কলকাতায়! নইলে সেই পাথর নিয়ে কলকাতাতেই খুন হয়ে গেল মেটেবুরুজে! এখানে আনলে সে-পাথর আমরা হাতে রাখতে পারতাম না!

জামাতুল্লা গলার স্বর নীচু করে বললে–বাবুজি, এখানেও লোক পেছন নিয়েছে।

সুশীল ও সনৎ একযোগে সবিস্ময়ে বলে উঠল–কীরকম!

এখন বলব না, আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন। সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা–এখানে দিনদুপুরে মানুষের বুকে ছুরি বসায়–পরে শুনবেন।

সিঙ্গাপুরে যেদিকে বড়ো ডক তৈরি হয়েছে, ওর কাছে অনেক দূর পর্যন্ত সামরিক ঘাঁটি। সাধারণ লোককে সেসব রাস্তা দিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। জামাতুল্লাকে পথপ্রদর্শকরূপে নিয়ে দু-জনে সেই দিকে বেড়াতে বেরোলো। সমুদ্রের নীল দিগন্ত-প্রসারী রূপ এখান থেকে যেমন দেখায়, এমন আর কোথাও থেকে নয়। দুপুরের কাছাকাছি সময়টা প্রখর রৌদ্রকিরণে সমুদ্র জল ইস্পাতের ছুরির মতো ঝকঝক করছে। দু-খানা মানোয়ারি জাহাজ বন্দর থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

একজন চীনেম্যান এসে ওদের পিজিন ইংলিশে বললে–টি, স্যার, টি?

নো টি।

নো টি স্যার? মাই হাউস হিয়ার স্যার, ভেরি গুড হোম-মেড টি স্যার!

সনৎ বললে–চলো দাদা, চলো জামাতুল্লা, একটু চা খেয়ে আসি।

সবাই মিলে রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা চীনা বাঁশঝাড়ের আড়ালে একটা অ্যাসবেস্টস এর ঢেউ-খেলানো পাত দিয়ে ছাওয়া ছোট্ট বাড়িতে এল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাঁশের টেবিল পাতা আছে বারান্দায়। তিনজনে সেখানে বসে দূরে সমুদ্রের দৃশ্য দেখছে–এমন সময় চীনেম্যানটি চা নিয়ে এল। ওরা চা খাচ্ছে, সে লোকটা আবার কিছু কেক নিয়ে এসে ওদের সামনে রাখলে। ওদের বললে–তোমরা কোথায় যাবে?

সুশীল বললে–বেড়াতে এসেছি।

কোথা থেকে?

কলকাতা থেকে।

ভেরি গুড। চমৎকার জায়গা সিঙ্গাপুর।–এখান থেকে আর কোথাও যাবে নাকি?

না, আর কোথাও যাব না।

ভালো কিউরিও কিনবে?

কী জিনিস?

এসো না ঘরের মধ্যে।

ওরা তিনজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বুদ্ধের মূর্তি, মালা, ড্রাগনের মূর্তি, পোর্সিলেনের পেটমোটা চীনে ম্যাণ্ডারিনের মূর্তি ইত্যাদি সাধারণ শৌখিন জিনিস আলমারিতে সাজানো– ওরা হাতে করে দেখছে, এমন সময়ে সনৎ একটা জিনিস হাতে নিয়ে অস্‌ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠল–

দাদা দেখো!

সুশীল ও জামাতুল্লা দু-জনেই চেয়ে দেখলে, একখানা জেড পাথরে তৈরি ছুরির গায়ে কী আঁক-জোঁক কাটা। ভালো করে দু-জনেই দেখলে অবিকল সেই আঁক-জোঁক, নটরাজনের পদ্মরাগ মণির গায়ে যে আঁক-জোঁক ছিল।

ওরা সবাই অবাক হয়ে গেল।

সুশীল বললে–এ ছুরিখানার দাম কত?

দু-ডলার, মিস্টার।

এ ছুরি তুমি কোথায় পেলে?

দেখি ছুরিখানা? ও, এ আমি একজন মালয়ের কাছে কিনেছিলাম।

এখানেই?

হ্যাঁ, একজন মাল্লা ছিল সে।

কোথা থেকে সে ছুরিখানা পেয়েছিল তা কিছু বলেনি?

না মিস্টার। তবে ছুরিখানা সে ভয়ে পড়ে বিক্রি করে। সে বলেছিল দু-দু-বার সে প্রাণে মরতে মরতে বেঁচে যায়, এ ছুরিখানার জন্যে। তার পেছনে লোক লেগেছিল। লুকিয়ে আমার কাছে বিক্রি করে। কেউ জানে না যে এখানা আমার কাছে আছে।

আমরা এখানা নেব।

ওখানা বিক্রি হবে না।

আমরা তিন ডলার দেব।

নিয়ে বিপদে পড়বে তোমরা। ও নিও না।

তোমার দোকানের জিনিস বিক্রি করতে আপত্তি কী?

আমি আমার খরিদ্দারকে বিপদে ফেলতে চাইনে। শোনা মিস্টার, আমি জানি ও ছুরি তুমি কেন নিতে চাইছ। ওই আঁক-জোঁকগুলোর জন্যে–ঠিক কিনা? প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে অনেকে জানে ওই আঁকগুলো কোথাকার এক গুপ্ত নগর আর তার ধনভান্ডারের হদিশ। সকলে জানে না বটে, তবে পুরোনো লোক কেউ কেউ জানে। অনেক পুরোনো জেড পাথরের আংটিতে ওই আঁক-জোঁক আমি দেখেছি। ও নিয়ে একটা গুপ্ত সম্প্রদায় আছে। সম্প্রদায়ের বাইরে আর কারো কাছে এই আঁক-জোঁকওয়ালা আংটি কী ছুরি কী কিরিচ দেখলে তারা তার পেছনে লেগে গুপ্তহত্যা পর্যন্ত করে ফেলে–তবে তাদের আসল উদ্দেশ্য থাকে, জিনিসটাকে হস্তগত করা।

কেন?

পাছে অন্য কেউ ওই আঁক-জোঁকের হদিশ পেয়ে সেই প্রাচীন নগর আর তার গুপ্ত ধনভান্ডার আবিষ্কার করে ফেলে। ওরা নিজেরা যখন বের করতে পারলে না–তখন আর কাউকে ওরা খোঁজ করতেও দেবে না। ও চিহ্নের জিনিস কাছে রাখা মানে প্রাণ হাতে করে বেড়ানো। কিন্তু আমার মনে হয় কী জান, মিস্টার? ওরকম নগর কোথাও নেই। ও একটা মিথ্যা প্রবাদের মতো এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কেউ দেখেছে এ পর্যন্ত বলতে পার? কেউ বলতে পারে সে দেখেছে? কেউ সন্ধান দিতে পারে? ও একটা ভুয়ো গল্প।

চা খেয়ে বাইরে এসে তিনজনে সমুদ্রের দিকে চলল।

চীনেম্যানটি পিছন থেকে ডেকে বলল–ওদিকে যেও না মিস্টার, সামরিক সীমানা–যাওয়া নিষেধ। সমুদ্রের ধারে এদিকে বসবার জায়গা নেই।

একটু নির্জন স্থানে গিয়ে সুশীল বললে–জামাতুল্লা, শুনলে সব কথা? এখনও কি তোমার মনে হয় সে নগর আছে কোথাও? আমরা আলেয়ার পেছনে ছুটছি নে? নটরাজনের গল্প ভুয়ো নয়?

জামাতুল্লা বললে–তবে পদ্মরাগ মণি এল কোথা থেকে?

আমি তোমায় বলছি নটরাজনের কাহিনি আগাগোড়া বানানো গল্প। পদ্মরাগ মণিখানা সে কোনোপ্রকার অসৎ উপায়ে হস্তগত করে–যার ওপরে প্রাচীন ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী ওই চিহ্নটি-আঁকা ছিল। এ ছাড়া ওর কোনো মানে নেই।

জামাতুল্লার মুখ-চোখের ভাব হঠাৎ যেন বদলে গেল–কত বৎসর পূর্বের এক স্বপ্নভরা দিন, এক আতঙ্কভরা কৃষ্ণা রজনীর স্মৃতি তার মুখের রেখায়, চোখের দৃষ্টিতে। সে বললে– কিন্তু বাবুজি, নটরাজন হয়তো দেখেনি, আমি তা দেখেছি। ভীষণ বনের মধ্যে অন্ধকার রাত কাটিয়েছি। আমি কারো কথা শুনিনে।

খুব সাবধান জামাতুল্লা, আমাদের প্রাণের দাম এক কানাকড়িও না–যদি একথা কোনোরকমে প্রকাশ হয় যে আমরা ওই আঁক-জোক-পড়া পাথরের ছাঁচ বা সেই নগর খুঁজতে বেরিয়েছি।

ঠিক বাবুজি। সে-কথা আমারও মনে হয়েছে। এই সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা–এখানে পথে পথে রাত্রের অন্ধকারে খুন হয়। ভারি সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। ইয়ার হোসেনকে সাবধান করে দিতে হবে। মুশকিল হয়েছে লোকটা মাতাল, মদ খেয়ে কোনো কথা প্রকাশ করে না ফেলে। চলে, যাওয়া যাক।

তিনজনে সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে বাসার দিকে রওনা হল।

পরদিন ইয়ার হোসেন এসে ওদের বাসায় খুব সকালেই উপস্থিত হল। সনৎ তখন উঠেছিল। চায়ের জন্যে স্টোভ ধরিয়েছে–ইয়ার হোসেনকে দেখে বললে–আসুন মি. হোসেন, ঠিক সময়েই এসেছেন–চা তৈরি।

ইয়ার হোসেন রুক্ষ প্রকৃতির লোক। বলে উঠল–চা খাবার জন্যে ঠিক আসিনি। আরো দু-শো টাকা চাই।

হঠাৎ সনৎ-এর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল–আরও দু-শো! তাহলে তো আমাদের হাতে রইল না কিছু।

তা আমি কী জানি? এ কাজে এসেছেন যখন তখন পয়সার জন্যে হঠলে চলবে না। নয়তো বলুন ছেড়ে দিই।

না না, দাঁড়ান আমি দাদা ও জামাতুল্লাকে ডাকি।

সুশীল শুনে বললে–তাই তো, ব্যাপার কী? চলো, দেখি ব্যাপার কী।

ইয়ার হোসেন বাইরে বসে আছে। সুশীল গিয়ে বললে–গুড মর্নিং মি. হোসেন। কী মনে করে এত সকালে?

সব ঠিক। আজ রাত্রে রওনা হতে হবে। সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছে।

সনৎ ও সুশীল একসঙ্গে বলে উঠল–কীরকম?

ইয়ার হোসেন গম্ভীর মুখে বললে–সব ঠিক। তার আগে সেই ছাঁচখানা একবার দেখি–এখুনি। আর দু-শো টাকা–এখুনি।

সুশীলের ইঙ্গিতে সনৎ বাক্স খুলে প্যারিস-প্লাস্টারের ছাঁচ ওর হাতে দিলে। ইয়ার হোসেন ছাঁচখানা উলটে-পালটে দেখে-শুনে বললে–নাও। এসব বুজরুকি অন্য কিছুই না। কিছুই হবে না হয়তো।–টাকা?

সুশীল বললে–টাকা রয়েছে জামাতুল্লার কাছে। সে আসুক।

কোথায় সে?

তা তো জানিনে। সকালে বেড়াতে বেরিয়েছে।

আচ্ছা, আমি বসি।

এখন কী ঠিক করলেন বলুন মি. হোসেন।

এখান থেকে ডাচ স্টিমার বো ছাড়ছে আজ রাত দশটায়। আমাদের নামতে হবে সাঙ্গাপান বন্দরে–সুলু সমুদ্রের ধারে। সাঙ্গাপান মশলার বড়ো আড়ত–সেখান থেকে চীনে জাঙ্ক ভাড়া করে যাব।

এসব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ডাচ স্টিমারে উঠতে দেবে? মেশিনগান কিনেছেন নাকি?

সব ঠিক আছে। আপনি শুধু দেখুন ইয়ার হোসেন কী করতে পারে।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। জামাতুল্লা আর ফেরে না। সুশীল ও সনৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। কাল বিকেলের সেই চীনাম্যানের কথা বার বার মনে পড়ছিল ওদের। কথাটা ইয়ার হোসেনকে বলা ঠিক হবে না হয়তো–ভেবেই ওরা বললে না। কিন্তু জামাতুল্লা সব জেনে শুনে একা বেরোল কোথায়?

বেলা প্রায় দশটা। এমন সময় জামাতুল্লা ঘর্মাক্ত কলেবরে এসে হাজির হল।ওর মুখের চেহারা দেখে তিনজনেই একসঙ্গে বললে–কী হল তোমার?

জামাতুল্লা ক্ষীণ হাসি হেসে বললে–কিছুই না।

কিন্তু তোমার চেহারা দেখে–

এই রোদে—

সুশীল বললে–জামাতুল্লা, মি. হোসেন আরও দু-শো টাকা চান।

ও! তা দিন বাবু। এই নিন চাবি।

উনি বলছেন আজ রাত্রে আমাদের রওনা হতে হবে।

জামাতুল্লা সে-কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে বললে–টাকাটা দিয়ে দিন ওঁকে আগে।

টাকা নিয়ে ইয়ার হোসেন বিদায় নেবার পর-মুহূর্তেই জামাতুল্লা নিম্নসুরে বললে-বড়ো বেঁচে গিয়েচি! ডকের পাশে যে গলি আছে ওখানে দু-জন মালয় গুণ্ডা আমাকে আক্রমণ করেছিল। দু-জন দু-দিক থেকে কিরিচ হাতে। ভুড়ি ফাঁসিয়ে দিত আর-একটু হলে। আমি প্রাণপণে ছুটে বেঁচেছি। তোমরা অত ছুটতে পারতে না, মারা পড়তে ওদের হাতে। কালকের সেই চীনেম্যানের কথাই ঠিক। আমরা খুব বিপন্ন এখানে। বাড়ি থেকে কোথাও বেরিও না। ইয়ার হোসেনকে কিছু বোলো না।

সনৎ ও সুশীল রুদ্ধনিশ্বাসে ওর কথা শুনছিল। কথা শেষ হলে সনৎ তাকে চা ও টোস্ট খেতে দিয়ে বললে–কিছু বলিনি আমরা। ও আজই যেতে বলছে–শুনেছ তো?

যাতে হয় আজই আমাদের পালাতে হবে। এখন প্রাণ নিয়ে জাহাজে উঠতে পারলে বাঁচি!

বল কী জামাতুল্লা? এত ভয় নেই। চীনেম্যানটার বাজে গল্পটা দেখছি তোমার মনে বড়ো দাগ কেটে দিয়েছে।

বাবুজি, মেটেবুরুজের মাঠে খুনের কথাটা ভেবে দেখুন। সে পাথরখানার জন্যে নয়–আঁক-জোঁকের জন্যে। এখন আমার তাই মনে হচ্ছে। অসাবধান হবেন না আজ দিনমানটা। জাহাজে উঠলে কতকটা বিপদ কাটে বটে।

সেদিন বিকেলে ইয়ার হোসেনের লোক আবার এল। একটা সিলমোহর করা চিঠি সুশীলের হাতে দিয়ে বললে–এর উত্তর এখুনি চাই। সুশীল চিঠিখানা পড়ে দেখলে, আজ কীভাবে, কোথা থেকে রওনা হতে হবে, সেই ব্যবস্থা চিঠিতে লেখা। ইয়ার হোসেন অন্য পথ দিয়ে যাবে। ওদের যেন চেনে না, এভাবে। জাহাজে না উঠে এদের তিনজনের সঙ্গে সে কথাবার্তা বলবে না।

সুশীল চিঠির উত্তর দিয়ে দিলে। জামাতুল্লা বললে–আমাদের জিনিসপত্র যদি কিনতে হয়, এই সময় কিনে নিয়ে আসি–চলুন।

ওরা বেরিয়ে এল বাসা থেকে। ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটের বড়ো বাজারে জিনিসপত্র কিনবে এই ওদের ইচ্ছে। জামাতুল্লা বললে–বাবু, কিছু ভালো জিনিস খেয়ে নেওয়া যাক। জানেন, কোনো অজানা রাস্তায় অনেক দূর যেতে হলে, ভালো খেয়ে নিতে হয়। অনেকদিন হয়তো ভালো খাবার অদৃষ্টে জুটবে না।

একটা শিখ রেস্টুরেন্টে ওরা গিয়ে বসল। মাংস, কাটলেট, চা, টোস্ট ইত্যাদি আনিয়ে খাওয়া শুরু করেছে, এমন সময় একজন ইউরোপীয় পোশাক পরা মালয় এসে ওদের টেবিলে বসে বিনীতভাবে বললে–সে কি তাদের সঙ্গে বসে খেতে পারে?

সুশীল বললে–হ্যাঁ, নিশ্চয়।

সে আর কোনো কথা না বলে খাবার আনিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে খেতে লাগল। তারপর আবার ওদের দিকে চেয়ে বললে–আপনারা ভারতীয়?

সুশীল ভদ্রভাবে উত্তর দিলে–হ্যাঁ।

এখানে এসেছেন বেড়াতে, না?

হ্যাঁ।

কেমন লাগছে সিঙ্গাপুর?

বেশ জায়গা।

এখান থেকে দেশে ফিরছেন বোধ হয়?

তাই ইচ্ছে আছে।

আপনারা তিনজনে বুঝি এসেছেন?

না, আমরা এখানে এক হোটেলে থাকি–আলাপ হয়ে গিয়েছে।

বেশ, বেশ।

আপনারা কোন হোটেল উঠেছেন জানতে পারি কি? আমাদের একজন ভারতীয় বন্ধুর একটা ভালো হোটেল আছে, সেখানে খাবার-পত্র সস্তা। ঘরদোরও ভালো। যদি আপনাদের দরকার হয়–

সনৎ হঠাৎ বলে উঠল–না, ধন্যবাদ। আমরা আজই চলে যাচ্ছি।

সুশীল টেবিলের তলা দিয়ে সনৎকে এক রামচিমটি কাটলে। মালয় লোকটার চোখে-মুখে একটা কৌতূহলের ভাব জাগল। সেটা গোপন করে সে বললে–ও! আজই যাবেন?

কিন্তু ভারতের জাহাজ তো আজ ছাড়বে না?

সুশীল বললে–না, আমরা রেলে উঠে যাচ্ছি কুয়ালালামপুর।

ও, কুয়ালালামপুর? দেখে আসুন, বেশ শহর।

আরও কিছুক্ষণ পরে লোকটা বিল চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সুশীল রাগের সঙ্গে সনৎ-এর দিকে চেয়ে বললে–ছি ছি এত নির্বোধ তুমি? ও-কথা কেন বলতে গেলে?

সনৎ অপ্রতিভ মুখে বললে–আমি ভাবলাম ওতেই আপদ বিদেয় হয়ে যাবে। অত জিগগেস করার ওর দরকার কী? আমরা যদি-বা যাই, তোর তাতে কীরে বাপু?

তা নয়। কে, কী মতলব নিয়ে কথা বলে, দরকার কী ওদের সঙ্গে সব কথা বলার?

জামাতুল্লা বললে–ঠিক কথা বলেছেন বাবুজি।

সন্ধ্যার কিছু আগে ওরা রেস্টুরেন্ট থেকে বার হয়ে রাস্তায় নেমে দু-একটা জিনিস কেনবার জন্যে বাজারের দিকে চলেছে–এমন সময় জামাতুল্লা নীচু গলায় চুপিচুপি বললে–ওই দেখুন সেই লোকটা!

সুশীল ও সনৎ চেয়ে দেখলে, সেই মালয় লোকটা একটা দোকানে কী একটা জিনিস কিনছে। ওদের দিকে পিছন ফিরে।

সুশীল বললে–চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই–মোড়ের দোকানে জিনিস কিনি গে।

জিনিস কিনতে একটু রাত হয়ে গেল। ওরা বড়ো রাস্তা বেয়ে অনেকটা এসে ওদের হোটেল যে গলিটার মধ্যে সে-গলিটাতে ঢুকতে যাবে, এমন সময় কী একটা ভারি জিনিস সুশীলের ঠিক বাঁ-হাতের দেয়ালে জোরে এসে লেগে ঠিকরে পড়ল সামনে রাস্তার ওপরে।

ওরা চমকে উঠল। জামাতুল্লা পথের ওপর থেকে জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে–সর্বনাশ!

ওরা দু-জনে নীচু হয়ে জিনিসটা দেখতে গেল–কিন্তু জামাতুল্লা বললে–বাবুজি, ছুটে আসুন, এখানে আর দাঁড়াবেন না বলছি!

দু-জনে জামাতুল্লার পিছনে পিছনে দ্রুতপদে চলতে চলতে বললে–কী, কী হয়েছে? কী জিনিস ওটা?

মিনিট পাঁচ-ছয় ছুটবার পর নির্জন গলিটার শেষ প্রান্তে ওদের হোটেলটা দেখা গেল। জামাতুল্লা হাই ছেড়ে বললে–যাক খুব বেঁচে যাওয়া গিয়েছে! এখানা মালয় দেশের ছুঁড়ে মারা ছুরি! ওরা দশ-বিশ গজ তফাত থেকে এই ছুরি ছুঁড়ে লোকের গলা দু-খানা করে কেটে দিতে পারে। আমাদের তাগ করেই ছুরিখানা ছুঁড়েছিল–কিন্তু অন্ধকারে ঠিক লাগেনি। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে, যে ছুঁড়েছে তার আর-একখানা ছুরি ছুঁড়তেই বা কতক্ষণ?

সনৎ সেই ভারি ছোরাখানা হাতে করে বললে–ওঃ, এ গলায় লাগলে পাঁঠা কাটার মতো মুন্ডু কেটে ছিটকে পড়ত! কানের পাশ দিয়ে তির গিয়েছে!

সুশীল বললে–এ সেই গুপ্ত সম্প্রদায়ের লোকের কাজ। আমাদের পেছনে লোক লেগেছে।

জামাতুল্লা বললে–লোক লেগেছে, তবে আমাদের বাসাটা এখনওবার করতে পারেনি। আমি বলিনি যে এখানে আমরা বিপন্ন। আমার না বলবার কারণ আছে।

রাতে ডাচ স্টিমার বেন্দা ছাড়ল। ইয়ার হোসেন বড়ো বড়ো কেরোসিন কাঠের প্যাকবাক্স ওঠালে গোটাকতক জাহাজে–তাদের বাইরে বিলিতি বিয়ার মদের বিজ্ঞাপন মারা। ওঠাবার সময় অবশ্যি কোনো হাঙ্গামা হল না–কিন্তু সুশীল ও সনৎ-এর ভয় তাতে একেবারে দূর হয়নি। সিঙ্গাপুরের বন্দর ও প্রকান্ড নৌঘাঁটি ধীরে ধীরে দিকচক্রবালে মিলিয়ে গেল–অকূল জলরাশি আলোকোৎক্ষেপী ঢেউয়ে রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

চারদিনের দিন সকালে জাহাজ এসে সাঙ্গাপান পৌঁছোলো। এখানে এসে ওরা নেমে একটা চীনা হোটেলে আশ্রয় নিলে।

সাঙ্গাপান মশলার খুব বড়ো আড়ত, কতগুলি নদী এসে সমুদ্রে পড়ছে, নদীর সেই মোহনাতেই বন্দর অবস্থিত–যেমন আমাদের দেশের চট্টগ্রাম।

ইয়ার হোসেন বাংলা জানে না, উর্দু বা হিন্দুস্থানীও ভুলে গিয়েছে–ও জামাতুল্লার সঙ্গে কথা বলে পিজিন ইংলিশে ও মালয় ভাষায়। বললে–জামাতুল্লা, এবার তুমি তোমার সেই দ্বীপে নিয়ে যেতে পারবে তো?

পারব বলে মনে হচ্ছে। তবে এখনও ঠিক জানি নে–

সুশীল বললে–শুনুন মি. হোসেন। যখন আমার সঙ্গে জামাতুল্লার দেখা হয় গ্রামে, ও বলেছিল ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজের একটা দ্বীপে এর জাহাজ নারকেলের ছোবড়া ও কুচি বোঝাই করতে গিয়ে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যায়। কেমন, তাই তো জামাতুল্লা? রাস্তার কথাটা একবার ভালো করে ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

ঠিক বাবুজি—

তারপর বলে যাও—

তারপর আমরা সাতদিন সেইখানে থাকি।

ইয়ার হোসেন বললে–সেখানে থাকি মানে কী বুঝিয়ে বলো। দ্বীপে, না সমুদ্র?

না সাহেব, দ্বীপে তো নয়–আমরা যাচ্ছিলাম এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে। মাঝ দরিয়ায় এ কান্ড ঘটে। তারপর সৌরাবায়া থেকে জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করে।

কতদিন পরে উদ্ধার করে?

আট-দশ দিন কী ওইরকম।

সুশীল বললে–আগে বলেছিলে সাতদিন।

বাবু, ঠিক মনে নেই। অনেক দিনের কথা। সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে। সেই সময় সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে সব কলেরা হয়ে মারা গেল–বাকি ছিলাম কাপ্তান আর আমি। দ্বীপ ছিল নিকটেই–যেখানে ডুবো পাহাড়ে আমাদের জাহাজ ধাক্কা খেয়েছিল, সেখান থেকে ডাঙা নজরে পড়ে। জাহাজের রশির দু-রশি কী তিন রশি তফাতে। দ্বীপ দেখলে আমি চিনতে পারব–তার ধারে একটা পাহাড়, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝরনা পড়েছে সমুদ্রে। বড়ো বড়ো পাথর পড়ে আছে, পাথরগুলি সাদা রঙের।

সুশীল হেসে বললে–তোমার সেই বিস্মমুনির দ্বীপ?

জামাতুল্লা গম্ভীর মুখে বললে–হাসবেন না বাবুজি। এসব কাজে নেমে এ দেশের সব দেবতাকে মানতে হবে। না মানলে বিপদ হতে কতক্ষণ? আমি খুব ভালো করেই তা জানি।

ইয়ার হোসেন বললে–বুঝলাম, ও সব এখন রাখো। সাঙ্গাপান থেকে কোন দিকে যেতে হবে, কত দূরে? একটা আন্দাজ দাও–একটা নটিক্যাল চার্ট করে নেওয়া যাক।

আমরা সাঙ্গাপান থেকেই রওয়ানা হয়ে যাই পূর্ব-দক্ষিণ কোণে–আন্দাজ দু-শো মাইল– সেখান থেকে পূর্বে উত্তর-পূর্ব কোণে যাই আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল। এইখানে সেই ডুবো পাহাড়ের জায়গাটা–যতদুর আমার মনে হচ্ছে–

ইয়ার হোসেন অসহিষ্ণুভাবে বললে–যতদূর মনে হলে তো হবে না! আমাদের সে দিকে যেতে হবে যে। সুলু সমুদ্রের সর্বত্র তো ঘুরে বেড়াতে পারা যাবে না। আচ্ছা তুমি সে দ্বীপ কতদূর থেকে চিনতে পারবে? নেমে, না জাহাজে বসে?

জাহাজে বসে চিনতে পারব ওই সাদা পাথরের পাহাড় আর ঝরনা দেখে।

কত সাদা পাথরের পাহাড় থাকে–

না সাহেব, তা নয়। সে পাথরের পাহাড়ের গড়ন অন্য রকম। দেখলেই চিনব।

ইয়ার হোসেন আর সুশীল দু-জনে মিলে মোটামুটি ম্যাপ এঁকে নিয়ে সেদিন রাত্রে আর একবার মিলিয়ে নিলে জামাতুল্লার বর্ণনার সঙ্গে। চীনা জাঙ্ক ভাড়া করা হল। দু-

মাসের মতো চাল, আটা, চা, চিনি বোঝাই করে নেওয়া হল জাঙ্কে–আর রইলবিয়ারের কাঠের বাক্সভরতি অস্ত্রশস্ত্র ও মেশিনগান।

ইয়ার হোসেন প্রস্তাব করলে–এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। আজ রাত্রেই যাওয়া যাক–শত্রু লাগতে পারে–

জামাতুল্লা বললে–সেকথা ঠিক। কিন্তু রাত্রে হারবার-মাস্টার জাহাজ কী নৌকো ছাড়তে দেবে না, পোর্ট পুলিশে ধরবে। এসব জায়গায় এই নিয়ম। বোম্বেটে ডাকাতের আড্ডা কিনা সুলু সি! কড়া নিয়ম সব।

তবে?

কাল সকালে চলুন সাহেব—

ইয়ার হোসেন দ্বিধার সঙ্গে এ প্রস্তাবে মত দিলে। সুশীলকে ডেকে বললে–রাতের অন্ধকারে যাওয়া ভালো ছিল। দিনের আলোয় সকলের মনে কৌতূহল জাগিয়ে যাওয়া ভালো না। যাই হোক, উপায় কী?

সকাল আটটার পরে সাঙ্গাপান থেকে ওদের নৌকো ছাড়ল। মাত্র দেড় টনের চীনা জাঙ্ক –সমুদ্রে মোচার খোলার মতো। কিন্তু জামাতুল্লা বললে–জাঙ্ক হঠাৎ ডোবে না, এসব তুফানসংকুল সমুদ্রে পাড়ি দিতে চীনা জাঙ্ক-এর মতো জিনিস নেই।

জাহাজ ছেড়ে অনেক দূর এল, ক্রমে চারিধারে শুধু সমুদ্রের নীল জলরাশি।

জামাতুল্লা নাবিক ও কর্ণধার–কিন্তু যে বৃদ্ধ চীনাম্যান জাঙ্কের সারেং সেও দেখা গেল বেশ জাহাজ চালাতে জানে। দু-দিন জাহাজ চলবার পরে জামাতুল্লার সঙ্গে চীনা সারেং-এর ঝগড়া বেধে গেল।

ইয়ার হোসেন বললে–চেঁচামেচি কেন? কী হয়েছে?

চীনা সারেং বললে–জামাতুল্লা সাহেব জাহাজ চালাতে জানে না–কোথায় নিয়ে যাচ্ছে–

জামাতুল্লা বললে বিশ্বাস করবেন না ওর কথা! ও লোকটা একেবারে বাজে।

ইয়ার হোসেন ও সুশীল পরামর্শ করে জামাতুল্লার ওপরই কিন্তু জাহাজ চালানোর ভার দিলে। একদিন সন্ধ্যার সময়ে দূরে ডাঙা ও আলোর সারি দেখা গেল।

চীনা সারেং ছুটে গিয়ে বললে–ওহে, বড়ো যে জাহাজ চালাচ্ছ–ও ডাঙা আর আলো কোথাকার? এদিকে এত বড়ো ডাঙা কীসের?

জামাতুল্লাও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। চার্ট অনুসারে ওখানে আলো আর ডাঙা দেখবার কথা নয়। চীনা সারেং ইয়ার হোসেনকে আর সুশীলকে ডেকে বললে–ওকে বলতে বলুন স্যার, ও আলো আর ডাঙা কীসের?

জামাতুল্লাকে মাথা চুলকোতে দেখে চীনা সারেং বিজয়গর্বে বললে–আমি বলে দিচ্ছি স্যার –সাণ্ডা প্রণালীর মুখে পিয়েরপং বন্দরের আলো–তার মানে বুঝেছেন? আমরা আমাদের যাবার রাস্তা থেকে এক-শো মাইল পূর্ব-দক্ষিণে হঠে এসেছি–এইরকমকরে জাহাজ চালালে দক্ষিণমেরুতে পৌঁছোতে আমাদের আর বেশি দেরি থাকবে না স্যার!

চীনা সারেং সেদিন থেকে হল কাপ্তেন।

সুশীল বললে–রাগ কোরো না জামাতুল্লা। তুমি অনেকদিন এ কাজ করোনি, ভুলে গিয়েছ। হে।

জামাতুল্লা বললে–তা নয় বাবুজি। আমি ভুলিনি জাহাজ চালানো। আমার চার্ট ঠিক ছিল, আমার মনে হয় কী গোলমাল হয়েছে বা চার্টে ভুল করে রেখেছে।

আরও তিনদিন পরে বিকেলের দিকে চীনা কাপ্তেন বললে–পারা নামছে স্যার, দড়িদড়া সামলে আর জিনিস সামলে আপনারা খোলের মধ্যে নেমে যান–ঝড় উঠবে।

তিন ঘণ্টার মধ্যে ভীষণ ঝড় এল পূর্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে। দড়িদড়া ছিঁড়ে পাল উড়িয়ে নিয়ে যায়–জামাতুল্লা চিৎকার করে বললে–সব খোলের মধ্যে যান–ভয়ংকর ঢেউ উঠেছে—

জাঙ্কের ডেকের ওপর বড়ো বড়ো ঢেউ সবেগে আছড়ে পড়ে ক্ষুদ্র দেড় টনের জাঙ্কখানা যেকোনো মুহূর্তে ভেঙেচুরে সমুদ্রের তলায় ডুবিয়ে দেবে মনে হল সবারই–কিন্তু দু-তিন বার জাঙ্কখানা ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল–নাকানি-চুবুনি খেয়েও আবার সমুদ্রের ওপর ঠেলে ওঠে। সাবাস মোচার খোলা!

হঠাৎ চীনা কাপ্তেন চিৎকার করে উঠল–সামনে পাহাড়–সামলাও–

জামাতুল্লা হালে ছিল, ডাইনে সজোরে হাল মারতেই কান ঘেঁষে কতকগুলো বজবজে সমুদ্রের ফেনা ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে চলে গেল, ফেনাগুলোর মাঝে

কালো রঙের কী একটা টানা রেখা যেন ফেনারাশিকে দু-ভাগে চিরে দিয়েছে। ডুবো পাহাড়।

ঝড়ের শব্দে কে, কী বলে শোনা যায় না–তবুও সুশীল শুনলে, চীনা কাপ্তেন চিৎকার করছে–খুব বাঁচা গিয়েছে। আর একটু হলেই সব শেষ হত আমাদের!

ইয়ার হোসেন ও সুশীল বাইরে একচমক দেখতে পেলে–জলের মধ্যে মরণের ফাঁদ পাতাই বটে! সাক্ষাৎ মরণের ফাঁদ!

জামাতুল্লা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হাল ধরে আছে। একটু আলগা হলেই এই ভীষণ জায়গায় জাঙ্ক বানচাল হয়ে ধাক্কা মারবে গিয়ে বাঁ-দিকের ডুবো পাহাড়ে। খানিকটা পরে জামাতুল্লার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল ভয়ে–এ কী! দু-দিকেই যে ডুবো পাহাড়!–ডাইনে আর বাঁয়ে।

চীনা কাপ্তেনকে হেঁকে বললে–কোথা দিয়ে জাহাজ চালাচ্ছ গাধার বাচ্চা! পাহাড়ের চুড়ো দিয়ে যে! মারবে এবার–ঝড়ের তুফানের মধ্যে চীনা কাপ্তেনের কথাগুলো অট্টহাস্যের মতো শোনা গেল। কী যে সে বললে, জামাতুল্লা বুঝতে পারল না।–কিন্তু যারই ভুল হোক, জাহাজ বাঁচাতে হবে।

সে সামনে-পিছনে চেয়ে দেখলে–পাহাড়ের কালো রেখা অতিকায় শুশুকের শিরদাঁড়ার মতো জলের ওপর স্পষ্ট জেগে; মাস্তুলের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা সারেং সব পাল গুটিয়ে ফেলেছে–কেবল মাঝের বড়ো মাস্তুলে ষোলো ফুট চওড়া বড়ো পালখানা ঝড়ের মুখে ছিঁড়ে ফালি-ফালি হয়ে অসংখ্য সাদা নিশানের মতো উড়ছে। সে দেখলে নিশানগুলোর জন্যে জাহাজখানা এদিকে-ওদিকে হেলছে ঘুরছে। চক্ষের নিমেষে সে কোমর থেকে ছুরি বার করে পালের মোটা সনের কাছি কাটতে লাগল। একবার করে খানিকটা কাটে, আবার ছুটে গিয়ে হাল টিপে ধরে।

অমানুষিক সাহস ও দৃঢ়তা এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাঁচ ছ-মিনিটের মধ্যে সে অত বড়ো মোটা রশিটা কেটে ফেললে। ফেলতেই দড়িদড়া ঢিলে পড়ে পাল সড়াং করে অনেকখানি নেমে এল।

চীনা কাপ্তেন চিৎকার করে বললে–কে রশি কাটলে?

আমি।

খুব ভালো কাজ করেছ! এবার সামলাও ঠ্যালা! যদি জান না কোনো কিছু, তবে সবটাতেই সর্দারি করতে আস কেন?

চীনা কাপ্তেন মিথ্যে বলেনি। জামাতুল্লা সভয়ে দেখলে পালে ঢিলে পড়াতে জাঙ্ক এবার জগদ্দল পাথরের মতো ভারী হয়ে পড়েছে যেন। পিছন থেকে বাতাস ঠেলা মেরেও তাকে নড়াতে পারছে না–সুতরাং দু-দিকের মরণ ফাঁদকে অতিক্রম করে বাহির সমুদ্রে পড়তে এর অনেক সময় লেগে যাবে–ইতিমধ্যে বাতাস দিক পরিবর্তন করলেই–বিষম বিপদ।

ইয়ার হোসেন পাকা লোক। সে বুঝেছিল কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। মাথা বার করে বললে–কী হল আবার? জাঙ্ক নড়ে না যে!

চীনা সারেং বললেনড়বে কী স্যার-নড়বার পথ কি আর রেখেছে জামাতুল্লা? এবার বাঁচাতে পারলাম না বোধ হয়!

কিন্তু সুখের বিষয় আধঘণ্টার মধ্যে ভয় কেটে গেল। বাতাস পিছন হতেই বয়ে চলল একটানা–এবং আধঘণ্টার মধ্যে জাঙ্ককে ডুবো পাহাড়ের ফাঁদ পার করে বাহির সমুদ্রে তাড়িয়ে দিলে।

জামাতুল্লা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

চীনা কাপ্তেন টিটকিরি দিয়ে বললে–বাঁচলে সবাই আজ নিতান্ত বরাতের জোরে! তোমার হাতের গুণে নয়, মনে রেখো।

সমুদ্র শান্ত, জ্যোৎস্না উঠেছে–সুশীলদের দল খোলের ঢাকনি খুলে ডেকের ওপরএসে দাঁড়াল।

হঠাৎ জ্যোৎস্নার মধ্যে দূরে কী একটা বিরাট কালো জিনিস দেখা গেল–জল থেকে উঁচু হয়ে আছে মাথা তুলে।

ইয়ার হোসেন বললে–কী ওটা?

সুশীলও জিনিসটা প্রথমে দেখতে পেলে না–তারপর দেখে বিস্মিত হল–অস্পষ্ট কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নালোকে কিছু ভালো দেখা যায় না–তবু একটা প্রকান্ড কৃষ্ণকায় দৈত্যের মতো আকাশের গায়ে কী ওটা জল থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে?

সনৎও সে-দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল।

একমাত্র জামাতুল্লা দু-চোখ বিস্ফারিত করে জিনিসটার দিকে চেয়েছিল।

ইয়ার হোসেন কথার উত্তর না পেয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, জামাতুল্লা তাকে হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে ডেকের সম্মুখভাগে এগিয়ে এসে কালো জিনিসটা ভালো করে দেখতে লাগল।

চীনা সারেং টিটকিরি দেওয়ার সুরে বললে–দেখছ কী, ওটা ডুবো পাহাড়–বুড়ো বয়সে চোখে ভালো দেখতে পাইনে–তবুও বলছি

সুশীল বললে–জলের উপর জেগে রয়েছে যে! ডুবো পাহাড় কী করে হল?

চীনা সারেং বললেও পাহাড়ের চুড়োটা মাত্র জেগে আছে জলের ওপর, স্যার। প্রকান্ড ডুবো পাহাড় ওটা–

জামাতুল্লা এইবার সুশীলকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললে–সারেং ঠিক বলেছে। এতক্ষণ পরে আমি চিনেছি, এই সেই পাহাড় বাবুজি–এই পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েই–

সুশীল অবিশ্বাসের সুরে বললে–চিনলে কী করে?

আমি এতক্ষণ তাই চেয়ে দেখছিলাম–এবার আমার কোনো সন্দেহ নেই–ওই ডুবো পাহাড়ের এক জায়গায় দক্ষিণ কোণে একটা শুয়োরের মুখের মতো ছুঁচলো গড়ন দেখছেন কি? আসুন আমি দেখাচ্ছি–এতকাল আমার মনে ছিল না, কিন্তু এবার দেখেই মনে পড়েছে।

ইয়ার হোসেনকে বলি?

কিন্তু ওই হলদেমুখো চীনাটাকে কিছু বলবেন না, বাবুজি। ওটাকে আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না–আপনি বলুন হোসেন সাহেবকে–

যদি ও-ই সেই ডুবো পাহাড়টা হয়, তবে তো ওখান থেকে জমি দেখা যাবে, আর সেই সাদা পাথরের পাহাড়টা—

সে হল তিন রশি চার রশি তফাতে বাবুজি–চাঁদনি রাতে সাদা পাথরের পাহাড় অত দূর থেকে ভালো দেখা যাবে না। সকাল হোক—

চীনা সারেং চিৎকার করে উঠল–হ্যাঁল সামলাবে না গল্প করে সময় কাটাবে–ডুবো পাহাড় সামনে, সে খেয়াল আছে?

জামাতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে–আঃ, হলদেমুখো ভূতটা বড় জ্বালালে দেখছি–দাঁড়ান বাবুজি–আপনি হোসেন সাহেবকে বলুন, আমি দেখি ওদিকে কী বলে–

সুশীল হাসতে হাসতে বললে–তুমি যাই বল, ও কিন্তু খুব পাকা জাহাজি–এসবঅঞ্চল দেখছি ওর নখদর্পণে–ওস্তাদ জাহাজি–এ বিষয়ে ভুল নেই—

কিছু পরে চীনা সারেং তার নাবিকগিরির সুদক্ষতার এমন একটি প্রমাণ দিলে যাতে জামাতুল্লাকে পর্যন্ত তারিফ করতে হল। জামাতুল্লার হাল পরিচালনায় জাঙ্ক যখন ডুবো পাহাড়ের একদিক দিয়ে যাবার চেষ্টা করছে তখন চীনা সারেং হুকুম দিলে–সামনে এগোও–পাশ কাটাবার চেষ্টা করছ কেন?

সামনে এগিয়ে ধাক্কা খাবে নাকি?

এই বিদ্যে নিয়ে মাঝিগিরি করতে এসেছ সুলু সি-তে? নিজের দেশে নদী খালে ডোঙা চালাও গে যাও গিয়ে! ওই পাহাড়ের দু-পাশের ভীষণ চাপা স্রোতের মুখে পড়ে জাঙ্ক পাহাড়ের গায়ে সজোরে ধাক্কা মারবে–সে খেয়াল আছে? তোমার হালের সাধ্যি হবে না সে স্রোতের বেগ সামলানো–দেখছ না জল কীরকম ঘুরছে?

জামাতুল্লা তখনও ইতস্তত করছে দেখে চীনা সারেং হেঁকে বললে–জামাতুল্লা এবার সবাইকে মারবে স্যার–ওকে বুঝিয়ে বলুন, একবার ওর হাত থেকে ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন–এবার বোধ হয় আর রক্ষে হয় না–

সুশীল আর ইয়ার হোসেন জামাতুল্লাকে বললে–ও যা বলছে তাই করো না জামাতুল্লা–

ও কী বলছে তা আপনারা খেয়াল করছেন না? ও বলছে ওই ডুবো পাহাড়ের দিকে সোজাসুজি হাল চালাতে–মরব তো তাহলে–

চীনা সারেং জামাতুল্লার কথা শুনতে পেয়ে বললে–চালিয়ে দেখোই না কী করি। মরণের অত ভয় করলে মাল্লাগিরি করা চলে না সাহেব–

জামাতুল্লা চোখ পাকিয়ে বললে–হুঁশিয়ার! আমি আর যাই হই–মরণের ভয় করি তা তুমি বলতে পারবে না, হলদেমুখো বাঁদর—

সুশীল ধমক দিয়ে বললে–ও কী হচ্ছে জামাতুল্লা? এ সময়ে ঝগড়া-বিবাদ করে লাভ কী? সারেং যা বলছে তাই করো—

জামাতুল্লা হাতের চাকা ঘোরাতেই জাঙ্ক পাহাড়ের একেবারে বিশ গজের মধ্যে এসে পড়ল –ঠিক একেবারে সামনা-সামনি–সবাই দুরুদুরু বক্ষে চেয়ে আছে, সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর ঘাঁটি, এ থেকে কী করে চীনা জাঙ্ক বাঁচবে কেউ বুঝছে না–দেখতে দেখতে বিশ গজের ব্যবধান ঘুচে গেল–দশ গজে

আর বুঝি জাঙ্ক রক্ষা হয় না–মতলব কী চীনাটার?... সবাই বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে আছে বুকের ভিতর চেঁকির পাড় পড়ছে সবারই–হঠাৎ সারেং ক্ষিপ্রহস্তে প্রকান্ড একটা জাহাজি কাছি সুকৌশলে সামনের দিকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বললে–ডাইনে হাল মারো–

সঙ্গেসঙ্গে একটা আশ্চর্য কান্ড ঘটে গেল যা ইয়ার হোসেন ও জামাতুল্লা তাদের জাহাজি মাল্লা-জীবনের অভিজ্ঞতায় কখনো দেখেনি। জাহাজ ডান দিকে ঘুরে পাহাড়ের গুঁড়িটা পেরিয়ে যেতেই সারেং-এর কাছি গিয়ে পাহাড়ের সরু অংশটা জড়িয়ে ধরল এবং পেছন দিক দিয়ে ঘড় ঘড় করে নোঙর পড়ার শব্দে সবাই বুঝল বড়ো সি-অ্যাঙ্কর অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে ফেলার বড়ো নোঙর তার সুদৃঢ় আঁকশির মুখ দিয়ে সমুদ্রের তলায় পাথর ও মাটি আঁকড়ে ধরলেই জাহাজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

বোঁ করে অতবড়ো জাঙ্কখানা ডিঙি নৌকোর মতো ঘুরে গেল আর পরক্ষণেই স্থির, অচল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল পাহাড় থেকে তিন-চার গজের মধ্যে। জাঙ্ক আর পাহাড়ের মধ্যে কেবল একফালি সরু সাগর–জল, একটা বড়ো হাঙর তার মধ্যে কষ্টে সাঁতার দিতে পারে।

ইয়ার হোসেন বলে উঠল–সাবাস সারেং।

সুশীল ও সনৎ নিশ্বাস ফেলে বললে–খুব বাঁচিয়েছে বটে—

জামাতুল্লা চুপ করে রইল।

চীনা সারেং হলদে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে–বিদেশি লোক এখানে জাহাজ চালাতে পারে না, স্যার! জামাতুল্লা মাল্লাগিরি যা জানে, তা খাটে চাটগাঁয়ের বন্দরে–এসব সে জায়গা নয়–এখানে জাহাজ চালাতে হলে পেটে বিদ্যে চাই অনেকখানি–

ইয়ার হোসেন বললে–এখন কী করা যাবে বল। জাহাজ তো আটকে গেল।

সারেং ওদের অভয় দিয়ে বললে–জাঙ্ক আটকায়নি। জোয়ার এলেই সকালে জাঙ্ক ছাড়া নিরাপদ।

সকলে দুরুদুরু বক্ষে সকালের প্রতীক্ষায় রইল। সুশীল আর জামাতুল্লা ভালো করে ঘুমোতেই পারলে না। খুব ভোরে উঠে জামাতুল্লাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে সুশীল বললে– এসো, চেয়ে দেখো–চলো বাইরে–

জামাতুল্লা বাইরে এসে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললে–ওই সেই সাদা পাহাড় আর সেই দ্বীপ! আমি কাল রাত্রেই বুঝেছিলাম বাবুজি, কাউকে বলিনি–

কেন?

কী জানি বাবুজি, চীনা সারেংটাকে আর এই হোসেন সাহেবকে আমার তেমন যেন বিশ্বাস হয় না, খোদার দিব্যি বলছি ওদের সামনে মুখ খোলে না আমার। হোসেন সাহেব আস্ত গুণ্ডালোক, বাধ্য হয়ে ওর সাহায্য নিতে হয়েছে, কিন্তু সিঙ্গাপুরে ওর নাম শুনে সবাই ভয় পায়।

সে-কথা আর এখন ভেবে লাভ কী বল। ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে যখন। ইয়ার হোসেনকে বলি কথাটা।

ইয়ার হোসেন সব শুনে জামাতুল্লাকে ডেকে বললে–কোনো সন্দেহ নেই তোমার? এই দ্বীপ ঠিক?

ঠিক।

আমরা নেমে কিন্তু জাঙ্ক ছেড়ে দেব–ঠিক করে দেখো এখনও।

সুশীল ও জামাতুল্লা আশ্চর্য হয়ে বললে–জাঙ্ক ছেড়ে দেবেন কেন?

আমি ওদের অন্য এক গল্প বলেছি। আমি বলেছি জঙ্গলে মাঠের ইজারা নিয়েছি ডাচ গভর্নমেন্টের কাছে–এখানে আমরা এখন থাকব কিছুদিন। ওদের বলতে চাই নে– চীনেরা লোক বড়ো ভালো না

দুপুরের পর জালি বোটে জিনিসপত্র ও দুটি ছোটো ছোটো তাঁবু সমেত ওদের সকলকে অদূরবর্তী দ্বীপের শিলাবৃত তীরভূমিতে নামিয়ে জাঙ্কের সারেং তার ভাড়া চুকিয়ে নিয়ে চলে গেল।

সুশীল ইয়ার হোসেনকে বললে–ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজের দ্বীপ তো এটা? ডাচ গভর্নমেন্টের কোনো অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু–

সেসব বড়ো হাঙ্গামা। ডাচ গভর্নমেন্টের কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে জান যাবে তাহলে; কেন যাচ্ছি আমরা–ও দ্বীপে কতদিন আমরা থাকব! হয়তো আমাদের সঙ্গে পুলিশ পাহারা থাকত–সব মাটি হত।

জামাতুল্লা দ্বীপের মাটিতে নেমে কেমন যেন স্বপ্নমুগ্ধের মতো চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। এতকাল পরে সে যে এখানে আসবে তা মেটেবুরুজের মাল্লাপাড়ার হোটেলে সানকিতে ভাত খেতে বসে কখনো কি ভেবেছিল? সে ভেবেছিল তার দুঃসাহসের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই বিস্মমুনির দ্বীপ আবার!

সুশীল ভাবছিল, কী অদ্‌ভুত যোগাযোগ! বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের জমিদারের ছেলে সে চিরকাল বসেই খাবে পায়ের ওপর পা দিয়ে, নির্বিঘ্নে জমিজমার খাজনা শোধ, দুপুরে লম্বা ঘুম দেবে, বিকেলে দুপুরে মাছ ধরবে, সন্ধ্যায় বৈঠকখানায় পৈতৃক তাকিয়া হেলান দিয়ে তাস দাবা খেলবে, রাত্রে পিঠে-পায়েস খেয়ে আবার ঘুম দেবে–এই সনাতন জীবনযাত্রা-প্রণালীর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি তার পিতৃপিতামহের বেলায়–তার বেলাতেও সে-ধারা অক্ষুণ্ণই থাকত, দৈবক্রমে সেদিন গড়ের মাঠে জামাতুল্লা খালাসি তার কাছে ম্যাচিস চাইতে না আসত। কত সামান্য ঘটনা থেকে জীবনের কত বৃহৎ ও গুরুতর পরিবর্তন শুরু হয়।

সুশীল ও সনৎ দ্বীপের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের ঘন বনানী এ পর্যন্ত তারা কোথাও দেখেনি–রীতিমতো ট্রপিক্যাল অরণ্য যাকে বলে, তা এতদিন সুশীল ছবিতেই দেখে এসেছে এবং ইংরেজি ভ্রমণের বইয়ে তার বর্ণনাই পড়ে এসেছে–এতকাল পরে তা সে দেখল। জলের ধার থেকেই অপরিচিত গাছপালার নিবিড় বন আরম্ভ হয়েছে–বনস্পতি মাতার বড়ো বড়ো গাছের গায়ে অর্কিডের ফুলগুলি সুগন্ধে প্রভাতের বাতাস মাতিয়েছে– মোটা মোটা লতা দুলছে এ গাছ থেকে ও গাছে। কত রঙের প্রজাপতি উড়ছে–সামনে সুনীল সমুদ্র প্রস্তরাকীর্ণ তীরভূমিতে এসে সজোরে ধাক্কা মারছে, একেবারে খোলা জলরাশি থইথই করছে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত, একটা ব্রেকওয়াটার পর্যন্ত নেই কোথাও–যদি কেউ জলে পড়ে, তবে হাঙরের আহার্য হবে এ জানা কথা–এসব সমুদ্রে হাঙরের উপদ্রব অত্যন্ত বেশি সুশীল আগেই শুনেছে। বনের মধ্যে অনেক জায়গায় এখনও অন্ধকার কাটেনি–কারণ প্রভাতের রৌদ্র তার মধ্যে এখনও অনেক জায়গাতেই ঢোকেনি–দেখে বোধ হয়, দুপুরেও ঢোকে কিনা সন্দেহ।

ইয়ার হোসেন দেখে-শুনে বললে–এ যে ভীষণ জঙ্গল দেখছি–। জামাতুল্লা বললে–আগে যেমন দেখেছিলাম তার চেয়েও যেন জঙ্গল বেশি হয়েছে।

সুশীল জানতে চাইলে এ দ্বীপে লোক আছে কিনা। ইয়ার হোসেন বললে–ম্যাপে তো কিছু দেয় না–এ দ্বীপের কিছুই দেখিনে ম্যাপে–কী জামাতুল্লা, তুমি কী দেখেছিলে?

কোথাও কিছু নেই।

বেশ ভালো জান?

আমার যাওয়ার পথে অন্তত তো কিছু দেখিনি—

এখান থেকে তোমার সে নগর কতদূর হবে আন্দাজ?

তিন চার দিনের পথ।

এত কেন হবে? এ দ্বীপের প্রস্থ তো খুব বেশি হবার কথা নয়!

সুশীল বললে–কত বলে আন্দাজ করছেন, মি. হোসেন?

ত্রিশ মাইলের মধ্যে। তবে একটা কথা, এই জঙ্গল ঠেলে যাওয়ায় পথ এগোবে না বেশি। অনেক জায়গায় পথ কেটে নিয়ে তবে এগোতে হবে। তিন দিন লাগা বিচিত্র নয়।

সেদিন তাঁবু খাঁটিয়ে দুপুরে বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে দ্বীপের মধ্যে ঢোকবার জন্যে ইয়ার হোসেন সবাইকে তৈরি হতে বললে। মালয় কুলি ওরা এনেছিল সাতজন, জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে–এরা সবাই ইয়ার হোসেনের হাতের লোক এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বী। ওদের গতিক বড়ো সুবিধের বলে মনে হয়নি সুশীলের ও সনৎ-এর গোড়া থেকেই। দেখে মনে হয় সিঙ্গাপুরে এরা চুরি ডাকাতি ও রাহাজানি করে চালিয়ে এসেছে এতদিন। যেমন দুশমনের মতো চেহারা, তেমনি ধূর্ত দৃষ্টি এদের চোখে। ইয়ার হোসেনের কথায় এরা ওঠে বসে। জামাতুল্লা এদের বিশ্বাস করত না। কিন্তু উপায় কী, ইয়ার হোসেনকে যখন দলে নিতে হয়েছে, তখন এদের রাখতে হবে।

দু-দিন সমুদ্রের ধারে তাঁবু ফেলে থাকবার পরে সকলে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সুশীল-সনৎ এমন জঙ্গল কখনো দেখেনি। গাছপালা যে এত সবুজ, এত নিবিড়, এত অফুরন্ত হতে পারে–বাংলা দেশের ছেলে হয়েও এরা এ জিনিসটা এই প্রথম দেখলে। ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো নদী বা খাঁড়ি–তার দু-পাশে যেন গাছপালা ও বনঝোঁপের সবুজ পর্বত–কত ধরনের অর্কিড, কত ধরনের লতা, কত অদ্ভুত ও বিচিত্র ফুল।

একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বন কাটতে কাটতে মোটে মাইল তিনেক এগিয়ে যেতে সক্ষম হল।

সন্ধ্যার দিকে ইয়ার হোসেন বললে–এখানে আজ তাঁবু ফেলা যাক।

কিন্তু তাঁবু ফেলবে কোথায়? সুশীল চারিদিকে চেয়ে দেখলে ভয়ানক ঘন জঙ্গলের মধ্যে বড়ো বড়ো দোলানো লতার তলায় ভিজে স্যাঁৎসেঁতে মাটির ওপর রাত্রে বাস করতে হবে। আজ সারাদিনের অভিজ্ঞতায় এরা দেখেছে এখানকার জঙ্গলে তিনরকম জীব যেখানে সেখানে বাস করে–যে তিনটিই মানুষের শত্রু। প্রথম, বড়ো বড়ো রক্ত-শোষক জোঁক; দ্বিতীয়, বিষধর সর্প; তৃতীয়, মৌমাছি। এই তিনটি শত্রুর কোনোটাই কম নয়–যেকোনোটার আক্রমণ মানুষের জীবন বিপন্ন হবার পক্ষে যথেষ্ট।

কোনো রকমে তাঁবু খাটানো হল।

ঘুমের মধ্যে কখন ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল–ট্রপিক্যাল অরণ্যের এ অঞ্চলে বৃষ্টি লেগেই আছে, এমন দিন নেই যে বৃষ্টি হয় না। ঘুমের মধ্যে সুশীল দেখলে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে কখন বৃষ্টির জলের ধারা গড়িয়ে এসে ওদের বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই।

হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে কোথায় এক গুরুগম্ভীর নিনাদ শোনা গেল–সমস্ত অরণ্য যেন কেঁপে উঠল।

সনৎ চমকে উঠে বললে–কে ডাকে দাদা?

অন্য তাঁবু থেকে ইয়ার হোসেন বলে উঠল–ও কীসের ডাক?

কেউ কিছু জানে না। না জামাতুল্লা না ইয়ার হোসেন–কেবল ইয়ার হোসেনের জনৈক অনুচর বললে–ওটা বুনো হাতির ডাক স্যার।

আর একজন অনুচর প্রতিবাদ করে বললে–ওটা গন্ডারের ডাক।

কিছুমাত্র মীমাংসা হল না এবং আবার সেই ডাক, সঙ্গেসঙ্গে অন্য এক জানোয়ারের ভীষণ গর্জন। সেটা শুনে অবশ্য সকলেই বুঝতে পারলে–বাঘের গর্জন।

এরই ফাঁকে আবার বন-মোরগও ডেকে উঠল। সময়ে এক-পাল বন্য কুকুরের ডাকও।

সনৎ বললে–ও দাদা, এ যে ঘুমোতে দেয় না দেখছি—

সুশীল উত্তর দিলে–কানে আঙুল দিয়ে থাকো—

ইয়ার হোসেন বললে–রাইফেল নিয়ে বসে থাকতে হবে–কেউ ঘুমিও না–

এটা নিতান্ত প্রথম দিন বলে এদের ভয় ছিল বেশি, দু-একদিনের মধ্যে জন্তুজানোয়ারের আওয়াজ গা-সওয়া হয়ে গেল। নিবিড় ট্রপিক্যাল জঙ্গলের মধ্যে প্রতি রাত্রেই নানা বন্য জানোয়ারের বিচিত্র আওয়াজ–আওয়াজ যা করে, তাঁবুর আশে-পাশেই করে–কিন্তু তাঁবুর লোককে আক্রমণ করে না।

সুশীল দু-দিন ঘুমোতে পারেনি–কিন্তু তিন রাত্রির পরে সে বেশ স্বচ্ছন্দে ঘুমোতে পারলে।

জঙ্গলের কূল-কিনারা নেই–ওরা পাঁচদিন ধরে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরেও কোনো কিছুই দেখতে পেলে না সেখানে–ওই বন আর বন।

সূর্যের আলো না দেখে সুশীল তো হাঁপিয়ে উঠল। এ জঙ্গলে সূর্যের আলো আদৌ পড়ে না।

আগে দেশে থাকতে সে দু-একখানা ভ্রমণের বইতে পড়েছিল যে মেক্সিকোতে, মালয়ে, আফ্রিকায় এমন ধরনের বন আছে, যেখানে কখনো সূর্যালোক প্রবেশ করে না। কথাটা আলংকারিকের অত্যুক্তি হিসেবেই সে ধরে নিয়েছিল, আজ সে সত্যই প্রত্যক্ষ করলে এমন বন, যা চিরঅন্ধকারে আচ্ছন্ন, পড়ন্ত বেলায় কেবল সুউচ্চ বনস্পতিরাজির শীর্ষদেশ অস্তমান সূর্যের রাঙা আলোয় রঞ্জিত হয় মাত্র। ক্বচিৎ নিবিড় লতাঝোঁপের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো চাঁদের আলো সামান্য-মাত্র পড়ে, নতুবা সকল সময়েই গোধূলি দিনমানে। চিরগোধূলির জগৎ এটা যেন।

একদিন সনৎ পড়ে গেল বিপদে।

তাঁবু থেকে বন্দুক হাতে শিকার করতে বার হয়ে সে একটা গাছের ডালে এক ভীষণ অজগর সাপ দেখে সেটাকে গুলি করলে। সাপটা দুলতে দুলতে গাছের ডাল থেকে পাক ছাড়িয়ে ঝুপ করে একবোঝা মোটা দড়াদড়ির মতো নীচে পড়ে গেল।

সনৎ সেটার কাছে গিয়ে দেখলে অজগরের মাথাটা গুলির ঘায়ে একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার ল্যাজটা হঠাৎ এসে সনৎ-এর পা দু-খানা জড়িয়ে ধরে শক্ত কাঠ হয়ে গেল। সরীসৃপের হিমশীতল স্পর্শ সনতের স্নায়ুগুলোকে যেন অবশ করে দিলে,

নিজের পা দু-খানাকে সে আর মোটেই নাড়তে পারলে না–হাতদুটোকে যখন কষ্টে নাড়ালে তখন লোহার শেকলের মতো নাগপাশের শক্ত বাঁধনে তার পদদ্বয় গতিশক্তিহীন।

অজগর তো মরে কাঠ হয়ে গেল, কিন্তু সনৎ চেষ্টা করেও কিছুতেই নাগপাশ থেকে পা ছাড়াতে পারলে না। পা যেন ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে, এমনকী সনৎ-এর মনে হল আর কিছুক্ষণ এ অবস্থায় থাকলে সে চিরদিনর মতো চলৎশক্তি হারাবে। এদিকে বিপদের ওপর বিপদ, বেলা ক্রমশ পড়ে আসছে–এরই মধ্যে গোধূলি গিয়ে যেন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে বনে। কিছুক্ষণ পরে দিক ঠিক করে তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হয়ে পড়বে। আরও কিছুক্ষণ কাটল, শেয়ালের দল বনের মধ্যে ডেকে উঠল–একটু পরেই বন্য হস্তীর বৃংহিত অরণ্যভূমি কাঁপিয়ে তুলবে, হায়েনার অট্টহাসিতে বুকের রক্ত শুকিয়ে দেবে।

সনৎ সবই বুঝছে–কিন্তু কোনো উপায় নেই। বন্দুকটার আওয়াজ করলে তাঁবুর লোকদের তার সন্ধান দেওয়া চলত বটে কিন্তু বন্দুকে গুলি নেই। শেষ দুটো টোটা অজগরের দিকে সে ছুঁড়েছে।

তিমিরময়ী রাত্রি নামল।

অসহায় অবস্থায় চুপ করে কাত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। প্রথমটা তার মনে খুব ভয় হল–কিন্তু মরীয়ার সাহসে সাহসী হয়ে শেষ পর্যন্ত সে চুপ করে শুয়েই রইল। মৃত অজগরটাকে অন্ধকারে আর দেখা যায় না কিন্তু তার হিমশীতল আলিঙ্গন প্রতিমুহূর্তে সনৎকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল যে প্রাণের বদলে সে প্রাণই নিতে চায়।

সারারাত্রি এভাবে কাটলে বোধহয় সনৎ সে যাত্রা ফিরত না–কিন্তু অনেক রাত্রে হঠাৎ সনৎ-এর তন্দ্রা গেল ছুটে। অনেক লোক আলো নিয়ে এসে ডাকাডাকি করছে। ইয়ার হোসেনের গলা শোনা গেল–হ্যাঁলু-উ-উ–মি. রায়–

সনৎ-এর সর্বশরীর ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গিয়েছিল–সে গলা দিয়ে স্বর উচ্চারণ করতে পারলে না। কিন্তু ইয়ার হোসেনের টর্চের আলো এসে পড়ল ওর ওপরে। সবাই এসে ওকে ঘিরে দাঁড়াল। পাশের মৃত অজগর দেখে ওরা আগে ভেবেছিল সর্পের বেষ্টনে সনৎও প্রাণ হারিয়েছে–তারপর ওকে হাত নাড়তে দেখে বুঝলে ও মরেনি।

তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করতে সনৎ চাঙা হয়ে উঠল।

ইয়ার হোসেন সেদিন ওদের ডেকে পরামর্শ করতে বসল।

জামাতুল্লাকে বললে–কই, তোমার সে মন্দিরের বা শহরের ধ্বংসাবশেষ তো দেখি নে কোনোদিকে।

জামাতুল্লা বললে–আমি তো আর মেপে রাখিনি মশাই ক-পা গেলে শহর পাওয়া যাবে –সবাই মিলে খুঁজে দেখতে হবে।

সুশীল একটা নকশা দেখিয়ে বললে–এ ক-দিনে যতটা এসেছি, জঙ্গলের একটা খসড়া ম্যাপ তৈরি করে রেখেছি। এই দেখে আমরা যে-যে পথে এসেছি দেখতে হবে, সে-পথে আর যাব না।

আবার ওদের দল বেরিয়ে পড়ল, দু-দিন পরে সমুদ্র-কল্লোল শুনে বনঝোঁপের আড়াল থেকে বার হয়ে ওরা দেখলে–সামনেই বিরাট সমুদ্র।

সনৎ চিৎকার করে বলে উঠল–আলাট্টা! আলাট্টা!

সুশীল বললে–তোমার এ চিৎকার সাজে না সনৎ। তুমি জেনোফনের বর্ণিত গ্রিক সৈন্য নও, সমুদ্রের ধারে তোমার বাড়ি নয়–

ইয়ার হোসেন বললে–ব্যাপার কী? আমি তোমাদের কথা বুঝতে পারছি নে–

সনৎ বললে–জেনোফন বলে একজন প্রাচীন যুগের গ্রিক লেখক–নিজেও তিনি একজন সৈনিক–পারস্য দেশের অভিযান শেষ করে ফিরবার সমস্ত দুঃখ-কষ্টটা দশ সহস্রের প্রত্যাবর্তন বলে একখানা বইয়ে লিখে রেখে গিয়েছেন–তাই ও বলছে–

ইয়ার হোসেন তাচ্ছিল্যের সুরে বললে–ও!

জামাতুল্লা বললে–আমার একটা পরামর্শ শোনো। কম্পাসে দিক ঠিক করে চলো এবার উত্তর মুখে যাই–ওদিকটা দেখে আসা যাক।

সকলেই একথায় সায় দিলে। সূর্যের মুখ না দেখে সকলেরই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। ওরা প্রথম দিনেই সমুদ্রের বালির ওপরে অনেকগুলো বড়ো বড়ো কচ্ছপ দেখতে পেলে। ইয়ার হোসেনের একজন অনুচর ছুটে গিয়ে একটাকে উলটে চিত করে দিলে, বাকিগুলি তাড়াতাড়ি গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মালয় দেশীয় দায়ের (মালয়েরা বলে বোলো) সাহায্যে কচ্ছপটাকে কাটা হল, মাংসটা ভাগ করে রান্না করে সকলে

পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলে। ভাগ করার অর্থ এই যে ইয়ার হোসেনের দল ও জামাতুল্লার রান্না হত আলাদা, সুশীল ও সনৎ-এর আলাদা রান্না সনৎ নিজেই করত।

একদিন সমুদ্রের ধারে বালির ওপরে কী একটা জানোয়ার দেখে সনৎ ছুটে এসে সবাইকে খবর দিলে।

সকলে গিয়ে দেখলে প্রকান্ড বড়ো শুয়োরের মতো বড়ো একটা জানোয়ার বালির ওপর চুপ করে শুয়ে। তার থ্যাবড়া নাকের নীচে বড়ো বড়ো গোঁফ–মুখের দু-দিকে দুটো বড়ো

বড়ো দাঁত।

ইয়ার হোসেন বললে–এ এক ধরনের সীল–সিঙ্গাপুরের সমুদ্রে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় বটে।

সীলের মূল্যবান চামড়ার লোভে সনৎ ওকে গুলি করতে উদ্যত হল।

ইয়ার হোসেন নিষেধ করে বললে–ওটা মেরো না–ও সীলকে বলে সী লায়ন, ও মারলে অলক্ষণ হয়।

পরদিন তাঁবু তুলে সকলে উত্তর দিকের জঙ্গল ভেদ করে রওনা হল। উত্তর দিকের জঙ্গলে সমুদ্রের ধার দিয়ে অনেকটা গেল ওরা। এক গাছ থেকে আর এক গাছে বড়ো বড়ো পুষ্পিত লতা সারাবন সুগন্ধে আমোদ করে ঝুলে পড়েছে–সুবৃহৎ লতা যেন অজগর সাপের নাগপাশে মহীরুহকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করছে–রাশি রাশি বিচিত্র অর্কিড। বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের পাখির দল ডালে ডালে–অদ্ভুত সৌন্দর্য বনের। সুশীল বললে–মি. হোসেন, ও কী লতা জানেন? যেমন সুন্দর ফুল–আর লতা দেখা যাচ্ছে না ফুলের ভারে– গন্ধও অদ্ভুত। ইয়ার হোসেন লতার নাম জানে না–তবে বললে, সিঙ্গাপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ওরকম লতা সে দেখেছে।

সারাদ্বীপে গভীর বন। বনের ভেতর দিয়ে যাওয়া কঠিন ও অনবরত গাছপালা কেটে যেতে হয় পথ করবার জন্যে–কাজেই ওরা সমুদ্রের ধার বেয়ে চলছিল। এক জায়গায় একটা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে বনের মধ্যে দিয়ে, নদী পার হয়ে যাওয়া কষ্টকর বলে ওরা বাধ্য হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নদী সরু হবার নাম নেই–অনেক দূরে বনের মধ্যে ঢুকে এখনও নদী বেশ গভীর।

সুশীল বললে–ওহে, নদীটা আমাদের দেশের বড়ো একটা খালের মতো দেখছি। এ দ্বীপে এত বড়ো নদী আসছে কোথা থেকে? তেমন বড়ো পাহাড় কোথায়?

নিশ্চয়ই বড়ো পাহাড় আছে বনের মধ্যে, সেইদিকেই তো যাচ্ছি–দেখা যাক–

আরও আধঘণ্টা সকলে মিলে গভীর জনহীন বনের মধ্যে দিয়ে চলল। বনের রাজ্য বটে এটা–সত্যিকার বন কাকে বলে এতদিন পরে প্রত্যক্ষ করল সুশীল-সনৎ।

হঠাৎ এক জায়গায় একটা নাগকেশর গাছ দেখে সুশীল বলে উঠল–এইদেখো একটা আশ্চর্য জিনিস! এই গাছ কোথাও এদিকে দেখা যায় না। নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ থেকে আমদানি এ গাছটা।

খুঁজতে খুঁজতে আশেপাশে আরও কয়েকটা নাগকেশর গাছ পাওয়া গেল। এইগভীর বনের মধ্যে নাগকেশর গাছ থাকার মানেই হচ্ছে এখানে কোনো ভারতীয় উপনিবেশের অস্তিত্ব ছিল পুরাকালে।

সনৎ বললে–কিন্তু এ গাছ তো খুব পুরোনো না, দেখেই মনে হচ্ছে। আটন-শো বছরের নাগকেশর গাছ কি বাঁচে?

তা নয়। ঔপনিবেশিক ভারতীয়দের নিজেদের হাতে পোঁতা গাছের চারা এগুলো। বড়ো গাছগুলির থেকে বীজ পড়ে পড়ে এগুলি জন্মেছে। এ গাছ অধস্তন চতুর্থ বা পঞ্চম পুরুষ আসল গাছের।

সেদিনই সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সনৎ বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা কৃষ্ণ-প্রস্তরমূর্তি দেখে চিৎকার করে সবাইকে এসে খবর দিলে। ওরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখলে গভীর জঙ্গলের লতাপাতার মধ্যে একটা ভাঙা পাষাণমূর্তি–মূর্তির মুন্ডু নেই, তবে হাত-পা দেখে মন হয় শিবমূর্তি ছিল সেটা, দু-হাত উঁচু প্রস্তর-বেদির ওপর মূর্তিটা বসানো, এক হাতে বরাভয়, অন্য হাতে ডমরু, গলায় অক্ষমালা–এত দূর দেশে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির এই চিহ্ন দেখে সুশীল ও সনৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল–সেখান থেকে যেন সরে যেতে পারে না। এই দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দুধর্মের বাণী বহন করে এনেছিল একদিন এদেশে। সুলু সমুদ্রের ওই ডুবো পাহাড় অতিক্রম করতে চীনা জাঙ্কওয়ালা যে কৌশল দেখালে, এই কম্পাস ও ব্যারোমিটারের যুগের বহু বহু পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষেরা সে-কৌশল একদিন না যদি দেখাতে পারতেন–তবে নিশ্চয়ই এ দ্বীপে পদার্পণ তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। মনে মনে সুশীল তাঁদের প্রণতি জানালে। নমো নমঃ দিগবিজয়ী পূর্বপুরুষগণ, আশীর্বাদ করো–যে বল ও তেজ তোমাদের বাহুতে, যে দুর্ধর্ষ অনমনীয়তা ছিল তোমাদের মনে, আজ তোমার অধঃপতিত দুর্বল উত্তরপুরুষেরা যেন সেই-বল ও তেজের আদর্শে

আবার নিজেদের গড়ে তুলতে পারে, সার্থক করতে পারে ভারতের নাম বিশ্বের দরবারে।

জামাতুল্লা ও ইয়ার হোসেনও চমৎকৃত হল। এ বনেও একদিন মানুষ ছিল তাহলে! এই যে গভীর বন আজ শুধু অজগর আর ওরাং ওটাংয়ের বিচরণক্ষেত্র, এখানে একদিন সভ্য মানুষের পদশব্দ ধ্বনিত হয়েছে, মন্দির গড়েছে, মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে–এ-ই সকলের চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার বলে মনে হল এদের কাছে।

জামাতুল্লাকে সুশীল বললে–কেমন, এসব দেখেছিলে বলে মনে হয়?

এসব দেখিনি। তবে এতে বোঝা যাচ্ছে মানুষের বাসের নিকটে এসে পড়েছি।

সে জায়গাটা কেমন?

সে একটা শহর বাবুজি। তার বাইরে পাঁচিল ছিল একসময়ে। এখন পড়ে গিয়েছে।

কম্পাস দেখে দিক ঠিক করেছিলে? ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউড ঠিক করেছিলে?

না বাবুজি, ওসব কিছু করিনি। কম্পাস ছিল না।

সকলের মনে আশার সঞ্চার হল যে এবার নিশ্চয়ই সেই প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি আসা গিয়েছে। কিন্তু তারপর তিনদিন কেটে গেল, চারদিন গেল, পাঁচদিন গেল– আবার সামনে সমুদ্রের পূর্ব তীর, আবার সুনীল সুলুসি। কোথায় নগর, কোথায়ই-বা কী। একখানা ইট বা পাথরও জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কারো চোখে পড়ল না আর। আবার হতাশ হয়ে পড়ল সকলে। জামাতুল্লাকে ইয়ার হোসেন বললে–জামাতুল্লা সাহেব, স্বপ্ন দেখনি তো হিন্দু-মন্দিরের আর শহরের? জামাতুল্লা গেল রেগে। ইয়ার হোসেনের অনুচরেরা নিজেদের মধ্যে কী বিড়বিড় করতে লাগল।

সুশীল সনৎ ও জামাতুল্লাকে গোপনে ডেকে বললে–ইয়ার হোসেনের ওই লোকগুলোকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে যদি কিছু চিহ্ন না পাওয়া যায়– দেখছি ওগুলো ভারি বদমাইশ!

জামাতুল্লা বললে–ভাববেন না বাবুজি, আমি ছুরি চালাব, আপনাদের জন্যে প্রাণ দেব! ওরা কী করবে? কাঠের ভেলা তৈরি করে সুলু সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিয়ে যাব–ওই হলদেমুখো চীনে জাঙ্কওয়ালা বড়ো বাহাদুরি করে গেল আপনাদের কাছে–দেখব ও কত বাহাদুর!

একদিন সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক আগে সুশীল বনের মধ্যে পাখি শিকার করতে বেরোলো বন্দুক নিয়ে। কিছুদূর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সে অস্পষ্ট গোধূলির আলোয় দূর থেকে একটা লম্বা পাহাড়-মতো দেখতে পেলে। আরও কাছে গিয়ে সে দেখলে পাহাড় ও তার মধ্যে একটা খাল, তাতে জল আছে–গভীর খাল। জলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। ভালো করে চেয়ে দেখে সে বুঝলে ওপারে ওটা পাহাড় নয়, একটা উঁচু পাঁচিল হতে পারে ওটা। খাল নয়, মানুষের হাতে কাটা পরিখা হয়তো। পাঁচিলের ওপর বড়ো বড়ো গাছ গজিয়েছে, মোটা মোটা শেকড় পাঁচিলের গা বেয়ে এসে মাটিতে নেমেছে–তাদের ডালপালার ফাঁক দিয়ে জায়গায় জায়গায় পাঁচিলের গায়ের বড়ো-বড়ো পাথরের চাঁইগুলি দেখা যাচ্ছে।

সুশীল আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল।

এই তবে সেই প্রাচীন নগরীর প্রাচীন ও পরিখা। এ বিষয়ে ভুল থাকতে পারে না–তবে, হয়তো সে উলটো দিক থেকে এটাকে দেখছে। নগরীর সিংহদ্বার অন্য দিকে আছে কোথাও।

সে যখন সকলকে গিয়ে খবর দিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার সমগ্র বনভূমিকে আচ্ছন্ন করেছে। ইতিমধ্যেই ওরাংওটাং ও শৃগালের ডাক শোনা যাচ্ছে। দু-একটা নিশাচর পাখি ছাড়া অন্য পাখির কূজন থেমে গিয়েছে। ডালপালার ফাঁকে ঊর্ধ্বে কৃষ্ণ আকাশে নক্ষত্রাদি দেখা দিয়েছে।

ইয়ার হোসেন বারণ করলে–এখন না, এ রাত্রিকালে তাঁবু ছেড়ে কোথাও যেও না, কাল সকালে দেখা যাবে।

সুশীলের আনা পাখি দিয়ে তাঁবুতে ভোজ হল রাত্রে।

জামাতুল্লা বললে–পাঁচিল যখন বেরিয়েছে–তখন আমায় মিথ্যেবাদী বলে বদনাম আর কেউ দিতে পারবে না। পরদিন সকলে গিয়ে দেখলে, সত্যই বিরাট প্রাচীর ও পরিখার অস্তিত্ব, ওদের সেখানে কোনো প্রাচীন নগরীর অস্তিত্বের নিদর্শনস্বরূপ বিরাজমান।

পরিখার জলে পদ্মফুল দেখে সুশীল ও সনৎ ভাবলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক যেন ওই ফুল। আটশো বছর আগে যে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ প্রথম পদ্মলতা এনে দুর্গপরিখার জলে পুঁতে দেয়, তারা আজ কোথায়? কিন্তু জলে একবার শেকড় গেড়ে যে পদ্মলতা বেঁচে উঠেছিল, সে বংশানুক্রমে আজও অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে এই গভীর অরণ্যের মধ্যে। ইয়ার হোসেনের আদেশে তার দু-জন অনুচর জল মেপে

দেখলে, এখানে পার হওয়া অসম্ভব। পরিখার জল বেশ গভীর। পরিখার এক বাহু ধরে এক দল ও অন্য দিকে অন্য বাহুর সন্ধানে অন্য দল বার হল।

শেষের দলে গেল সুশীল।

উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা প্রাচীর-পরিখার উত্তর দিকে আধ মাইল-টাক গিয়ে ওদের দল সবিস্ময়ে দেখলে প্রাচীরের এক স্থান ভগ্ন। মাঝখান বেয়ে বেশ একটা রাস্তা যেন ছিল সুপ্রাচীনকালে। এখন অবশ্য ঘন বন। দেখে মনে হয় শত্রু দ্বারা দুর্গ বা নগর-প্রাচীর হয়তো এখানে ভগ্ন হয়ে থাকবে, নতুবা এর অন্য কোনো কারণ নির্দেশ করা যায় না।

দেখা গেল পরিখার সেইখানে প্রাচীনকালে বোধহয় কাঠের সেতু ছিল, এখন সেটা ভেঙে পড়েছে জলে। জলের গভীরতা সেখানে কম। কাঠের সেতু প্রথমে দেখা যায়নি। ইয়ার হোসেনের জনৈক অনুচর প্রথমে জলের ধারে একটা শেকল দেখতে পায়। শেকলটা টেনে জলের মধ্য থেকে একখন্ড লোহার পাত বেরোলো। আন্দাজ করা কঠিন নয় যে এই লোহার পাত কাঠের চওড়া তক্তার গায়ে লাগানো ছিল। অনুমানটুকু ছাড়া কাঠের সেতুর অস্তিত্বের জন্য কোনো নিদর্শন এতকাল পরে কীভাবে পাওয়া সম্ভব হতে পারে!

ইয়ার হোসেন বললে–এখান দিয়ে পার হওয়া যাক–জল গম্ভীর হবে না।

সুশীল সামান্য একটু আপত্তি করলে–অথবা কেন যে করলে তা সে নিজেই জানে না।

প্রথমে নামল ইয়ার হোসেন নিজে–তার পেছনে নামল সুশীল। হাত তিন-চার মাত্র জলে যখন ওরা গিয়েছে তখন ওরা দেখলে সামনে জলের যা গভীরতা, তাতে আর অগ্রসর হওয়া চলবে না। ঠিক সেই সময় ওদের নিকট থেকে হাত পাঁচ-ছয় দূরে ইয়ার হোসেনের একজন অনুচর–যে শিকল টেনে তুলেছিল জল থেকে–সে নামল, উদ্দেশ্য, ওদের পাশাপাশি সেও পরিখা পার হবে। কিন্তু পরক্ষণেই এক ভয়াবহ কান্ড ঘটল।

সুশীল চোখের কোণ দিয়ে অল্পক্ষণের জন্যে দেখতে পেলে, লোকটার ছ-সাত হাত দূরে ছোট্ট কাঠের মতো কালো কী একটা জিনিস যেন ভাসছে। দু-সেকেণ্ড মাত্র, পরেই হঠাৎ যেন ভূমিকম্পে বিরাট জলোচ্ছাস উঠল, একটা আর্ত চিৎকার-ধ্বনি অল্পক্ষণের মধ্যে শোনা গেল... কীসের একটা প্রবল ঝাঁপটা এসে ওদের জলের ওপর কাত করে ফেললে...ওদের দু জনকে।

পরক্ষণেই ইয়ার হোসেনের সেই অনুচর অদৃশ্য।

কী হল ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারলে না–অবিশ্যি এক মিনিটও হয়নি এর মধ্যে সব ঘটে গেল।

সঙ্গেসঙ্গে ডাঙায় যারা ছিল তারা চেঁচিয়ে উঠল–শয়তান! শয়তান!

ইয়ার হোসেন আকুলভাবে চিৎকার করে বললে–ডাঙায় ওঠো–ডাঙায় ওঠো!

হতভম্ব সুশীল কাদা হাঁচড়ে মরি-বাঁচি ডাঙায় উঠল–পাশাপাশি ইয়ার হোসেন উঠল, জলে চেয়ে দেখলে জল কাদা-ঘোলা হয়েছে, ইয়ার হোসেনের অনুচর নিশ্চিহ্ন।

সুশীল ও ইয়ার হোসেন তখনও হাঁপাচ্ছে; সুশীলের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে!

সে ভীত কণ্ঠে বললে–কী হল?

ইয়ার হোসেন বললে–আমাদের সাবধানে জলে নামা উচিত ছিল। এইসব প্রাচীনকালের জলাশয়ে কুমির থাকা সম্ভব, একথা ভুলে গিয়েছিলাম। খোঁজো সবাই–

কুমির! সুশীল অবাক হয়ে গেল। কে জানত নগরীর পরিখায় কুমির থাকতে পারে। দুর্গপরিখার প্রহরী এরা–হয়তো প্রাচীন দিনেই শত্রুরোধকল্পে জলের মধ্যে কুমির ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সুবিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় এখনও তারা বাইরের লোকের অনধিকার প্রবেশে বাধাদান করছে।

খুঁজে কিছু হল না–জল কিছুক্ষণ পরে হতভাগ্য অনুচরের রক্তে রাঙা হয়ে উঠল। ইয়ার হোসেন বললে–আজ থামলে আমাদের চলবে না–এগোও। নগরের ফটক খোঁজো–

সুশীল বললে–জলের মধ্যে অজানা বিপদ। জল পার হওয়ার দরকার নেই– হেঁটে বা সাঁতরে। কোথাও সেতু আছে কি না দেখা যাক।

আবার উত্তর মুখে সকলে চলল। মাইল দুই সোজা চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল–কারণ ভীষণ জঙ্গল কেটে কেটে অগ্রসর হতে হচ্ছে। আগুন জ্বেলে তাঁবু ফেলে সেদিন সকলে সেখানে রাত্রি কাটাবার আয়োজন করলে। এমন সময় বহু দূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল–তার উত্তরে ওরাও একটা আওয়াজ করলে। দু-টি দলের মধ্যে যোগসূত্র রাখবার একমাত্র উপায় এই বন্দুকের আওয়াজ–অনেক দূর থেকে দক্ষিণগামী দলের এ হল সংকেত-ধ্বনি। পরদিন সকালে আরও এক মাইল

গিয়ে প্রাচীরের উত্তর দিক থেকে পূর্ব দিকে মুখ ফেরালে। অর্থাৎ এ দিকে আর শহর নেই। প্রাচীর ধরে সবাই বাঁকতে গিয়ে দেখলে পরিখার এপারে অনেকগুলো স্তূপ, স্তূপের ওপর বিরাট জঙ্গল। বড়ো বড়ো পাথর গড়িয়ে এসে পড়েছে স্তূপ থেকে নীচে–সেগুলি বেশ চৌকশ করে কাটা। সম্ভবত স্কুপের ওপর কোনো দুর্গ ছিল যা ঠিক নগর-প্রাচীরের উত্তর-পশ্চিম কোণ পাহারা দিত।

পশ্চিম মুখে কতটা যেতে হবে কেউ জানে না, কারণ তারা দৈর্ঘ্য ধরে যাচ্ছে, না প্রস্থ ধরে যাচ্ছে তা জানবার সময় এখনও আসেনি। সেদিনও কেটে গেল বনের মধ্যে; সন্ধ্যা নামল। সন্ধ্যায় যে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল, তার আওয়াজ খুব ক্ষীণ ও অস্পষ্ট।

সুশীল বললে–আমরা দৈর্ঘ্য অতিক্রম করেছি–প্রস্থ ধরে চলেছি। বুঝেছেন মি. হোসেন।

এবার বুঝলাম। ওদিকে যে দল গিয়েছে তারা ওদিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বন্দুক ছুড়ছে। অন্তত সাত মাইল দূর এখান থেকে।

পরদিন বেলা দশটার মধ্যে নগরীর সিংহদ্বার পাওয়া গেল। সেখানটাতে পরিখার ওপর পাথরের সেতু। এপারে সেতু রক্ষার জন্যে দুর্গ ছিল, বর্তমানে প্রকান্ড ভরা ঢিবি।

সকলে ব্যস্ত হয়ে সেতু পার হয়ে সিংহদ্বার লক্ষ করে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হয়েই থেমে গেল।

সিংহদ্বারের খিলান ভেঙে পড়ত–যদি বট-জাতীয় কয়েকটি বৃক্ষের শিকড় আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে না জড়িয়ে ধরে রাখত। সিংহদ্বারের দু-পাশে অদ্ভুত দুই প্রস্তরমূর্তি–নাগরাজ বাসুকি ফণা তুলে আছে সামনে, পেছনে তিনমুখবিশিষ্ট কোনো দেবতার মূর্তি। সূর্যের আলো ওপরের বটবৃক্ষের নিবিড় ডালপালা ভেদ করে মূর্তি দু-টির গায়ে বাঁকাভাবে এসে পড়েছে।

গম্ভীর শোভা। সুশীল শুধু নয়, দলের সকলেই দাঁড়িয়ে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইল এই কারুকার্যময় সিংহদ্বার ও প্রাচীন যুগের শিল্পীর হাতের এই ভাস্কর্যের পানে।

সুশীল হাতজোড় করে প্রণাম করলে মূর্তি দু-টির উদ্দেশ্যে। সে পুরাতত্ত্ব বা দেবমূর্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ না হলেও আন্দাজ করলে এ দুটি তিনমুখবিশিষ্ট শিবমূর্তি।

সুলু সমুদ্রের এই জনহীন অরণ্যাবৃত দ্বীপে প্রাচীন ভারতের শক্তি ও তেজ একদিন এই দেবমূর্তিকে স্থাপিত করেছিল। আজ ভারত অধঃপতিত,–দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত।

হে দেব, তোমার যে ভক্তগণ তোমাকে এখানে বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা আজ নেই– তাদের অযোগ্য বংশধরকে তুমি সেই শৌর্য ও সাহস ভিক্ষা দাও, তাদের বীরপুরুষদের বংশধর করে দাও, হে রুদ্রভৈরব!

ইয়ার হোসেন পর্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এই বিরাট ভাস্কর্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে বললে–যদি আমার দিন আসে, এই মূর্তি সিঙ্গাপুরের মিউজিয়ামে দান করবার ইচ্ছে রইল–

সুশীল বললে–তা কখনো করবেন না মি. হোসেন, যেখানকার দেবতা সেইখানেই তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিন। অমঙ্গলকে ডেকে আনবেন না।

সিংহদ্বার অতিক্রম করে ওরা নগরীর মধ্যে ঢুকল। কিন্তু অল্প কিছুদূর গিয়েই দেখলে, এত দুর্ভেদ্য জঙ্গল যে দশ হাত এগিয়ে যাবার উপায় নেই বন না কাটলে। সিংহদ্বারের সামনেই নিশ্চয় প্রাচীন নগরের রাজপথ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সে রাজপথের ওপরই তিন-চার-শো বছরের পুরোনো বট-জাতীয় বৃক্ষ, বন্য রবার, বন্য ডুমুর গাছ! এইসব বড়ো গাছের নীচে আগাছা ও কাঁটালতার জঙ্গল। ওরাংওটাংও এই জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হতে পারে না– মানুষ কোন ছার।

ইয়ার হোসেনের হুকুমে মালয় অনুচরেরা বোলো দিয়ে জঙ্গল কেটে কোনোরকমে একটু সঁড়িপথ বার করতে করতে সোজা চলল।

সুশীল বললে–এ জঙ্গল তো দেখছি নগরের বাইরে যেমন ছিল এখানেও তেমনি। কেবল এটা পাঁচিলের মধ্যে এই যা তফাত। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল–দেখুন! দেখুন!

সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল, সামনে প্রকান্ড একটা মন্দিরের চূড়া লতাঝোঁপের আবরণ থেকে অনেক উঁচুতে মাথা বের করে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের কাছে যাবার কোনো উপায় নেই–অনেক দূর থেকে বড়ো-বড়ো দেওয়াল ভাঙা পাথর ছড়িয়ে জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে অন্তত দেড়-শো হাত পর্যন্ত।

ওরা ডিঙিয়ে লাফিয়ে কোনোরকমে মন্দিরের সামনে বড়ো চত্বরের কাছে এল–কিন্তু সামনেই গোপুরমের মতো উঁচু পাইলন টাওয়ার। তার সুবিশাল পাথরের খিলান ফেটে চৌচির হয়ে সিংহদ্বারের মতোই আষ্টেপৃষ্ঠে বড়ো বড়ো শেকড় আর লতার বাঁধনে আজ কত যুগ যুগ ধরে ঝুলছে–তার ঠিকানা কারো কাছে নেই। গোপুরম ছাড়িয়ে মন্দিরের দেওয়াল, বিকটাকার দৈত্যের মুখের মতো সারি সারি অনেকগুলি মুখ দেওয়ালের গায়ে বেরিয়ে আছে–সুশীল আঙুল দিয়ে ওদের দেখিয়ে বললে–দেখো কী

চমৎকার কাজ! হয় পাথরের কড়ি নয়তো পয়োনালি, যাকে ইংরেজিতে বলে গর্গয়েল। অর্থাৎ বিকট জানোয়ারের মুখ বসানো নালি।

সকলেই অবাক হয়ে সেই কল্পনাসৃষ্ট ভীষণ মুখগুলোর দিকে চেয়ে রইল। সুন্দরকে গড়ে তোলে সেও যেমন কৌশলী শিল্পী, ভীষণকে যে রূপ দেয়, সে শিল্পীও ঠিক তত বড়ো। সুশীলের মনে পড়ল আনাতোল ফ্রাঁসের সেই গল্প, শয়তানকে এমন বিকট করে আঁকলে শিল্পী যে, রাতের অন্ধকারে শয়তান এসে শিল্পীকে জাগিয়ে জিজ্ঞেস করলে–তুমি আমাকে এর আগে কোথায় দেখেছিলে যে অমন করে এঁকেছ? শিল্পী বললে–আপনি কে?

শয়তান বললে–আমি লুসিফার। যাকে তোমরা বল শয়তান। ও নামটায় আমার ভয়ানক আপত্তি তা জান? তুমি কী বিশী করে এঁকেছ আমায়! আমি কি অত খারাপ দেখতে? দেখো না আমার দিকে চেয়ে!

শিল্পী দেখলে শয়তানের মূর্তি দেখতে বেশ সুন্দর, তবে মুখশ্রী ঈষৎ বিষণ্ণ। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে–আমায় মাপ করুন, আমি এর আগে দেখিনি আপনাকে। আমি স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েছে। আমি ভুল শুধরে নেব–

শয়তান হাসতে হাসতে বললে–তাই শুধরে নাও গে যাও–নইলে তোমার কান মলে দেব–

৩. মন্দিরের প্রাঙ্গণে

যাক। ওরা সবাই খিলানের তলা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মন্দিরের মধ্যেকার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল। শুধু ভীষণ কাঁটাগাছ আর বেত, যা থেকে মলঙ্কা বেতের ছড়ি হয়।

সনৎ ছেলেমানুষ, ভালো বেত দেখে বলে উঠল–দাদা, একটা বেত কাটব?

ইয়ার হোসেন তাকে ধমক দিয়ে কী বলতে যাচ্ছে, এমন সময় একটি সুন্দর পাখি এসে সামনের বন্য রবারের গাছের ডাল থেকে মন্দিরের ভাঙা পাথরের কার্নিশে বসল। সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল পাখিটার দিকে। কী সুন্দর! দীর্ঘ পুচ্ছ ঝুলে পড়েছে কার্নিশ থেকে প্রায় এক হাত–ময়ুরের পুচ্ছের মতো। হলদে ও সাদা আঁখি পালকের গায়ে–পিঠের পালকগুলো ঈষৎ বেগুনি!

ইয়ার হোসেন বললে–টিকাটুরা, যাকে সাহেব লোক বলে বার্ড অব প্যারাডাইজ–খুব সুলক্ষণ।

সনৎ বললে–বাঃ কী চমৎকার! এই সেই বিখ্যাত বার্ড অব প্যারাডাইজ! কত পড়েছি ছেলেবেলায় এদের কথা

সুশীল বললে–সুলক্ষণ কুলক্ষণ দু-রকমই দেখছি। কুমির নিলে একজনকে, আবার বার্ড অব প্যারাডাইজ দেখা গেল একটা সুলক্ষণ–

মন্দিরের বিভিন্ন কুঠরি। প্রত্যেক কুঠরির দেওয়ালে সারবন্দি খোদাই কাজ। সুশীল একখানা পাথরের ইট মনোযোগের সঙ্গে দেখলে। একজন ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁর পাশে বোধহয় গ্রহবিপ্র পাঁজি পড়ছেন। সামনে একসার লোক মাথা নীচু করে যেন রাজাকে অভিবাদন করছে। রাজার এক হাতে একটা কী পাখি–হয় পোষা শুক, নয়তো শিকরে বাজ।

ভারত! ভারত! কত মিষ্টি নাম, কী প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য ভান্ডার। তার নিজের দেশের মানুষ একদিন কম্পাস-ব্যারোমিটারহীন যুগে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এখানে এসে হিন্দুধর্মের নিদর্শন রেখে গিয়েছিল, তাদের হাতে-গড়া এই কীর্তির ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে গর্বে ও আনন্দে সুশীলের বুক দুলে উঠল। বীর তারা, দুর্বল হাতে অসি ও বর্শা ধরেনি, ধনুকে জ্যা রোপণ করেনি–সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে–এই অজ্ঞাত বিপদসংকুল মহাসাগর হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিগবিজয় করে নটরাজ শিবের পাষাণ-দেউল তুলেছে সপ্তসমুদ্র পারে।

পরবর্তী যুগের যারা স্মৃতিশাস্ত্রের বুলি আউড়ে টোলের ভিটেয় বাঁশবনের অন্ধকারে বসে বলে গিয়েছিল–সমুদ্রে যেও না, গেলে জাতটি একেবারে যাবে, হিন্দুত্ব একেবারে লোপ পাবে,তারা ছিল গৌরবময় যুগের বীর পূর্বপুরুষের অযোগ্য বংশধর, তাদের স্নায়ু দুর্বল, মন দুর্বল, দৃষ্টি ক্ষীণ, কল্পনা স্থবির।

তারা হিন্দু নয়–হিন্দুর কঙ্কাল।

দু-দিন ধরে ওরা বনের মধ্যে কত প্রাচীন দেওয়াল, ধ্বংসস্তূপ, দরজা, খিলান ইত্যাদি দেখে বেড়ালো। জ্যোৎস্না রাত্রি, গভীর রাত্রে যখন ওরাংওটাংয়ের ডাকে চারপাশের ঘন জঙ্গল মুখরিত হয়ে ওঠে, অজ্ঞাত নিশাচর পক্ষীর কুস্বর শোনা যায়, বন্য রবারের ডালপালায় বাদুড় ঝটাপটি করে, তখন এই প্রাচীন হিন্দু নগরীর ধ্বংসস্তূপে বসে সুশীল যেন মুহূর্তে কোন মায়ালোকে নীত হয়–অতীত শতাব্দীর হিন্দু সভ্যতার মায়ালোক–দিগবিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্ত কবি ও বীণ-বাজিয়ে যে মহাযুগের প্রতীক, হুনবিজেতা মহারথ স্কন্দগুপ্তের কোদন্ড টঙ্কারে যে যুগের আকাশ সন্ত্রস্ত।

সুশীল স্বপ্ন দেখে! সনৎকে বলে–বুঝলি সনৎ, জামাতুল্লাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ যে ও আমাদের এনেছে এখানে। এসব না দেখলে ভারতবর্ষের গৌরব কিছু বুঝতাম না!

সনৎ একথায় সায় দেয়। টাকার চেয়ে এর দাম বেশি।

ইয়ার হোসেন কিন্তু এসব বোঝে না। সে দিন দিন উগ্র হয়ে উঠেছে। এই নগরীর ধ্বংসস্তূপে প্রায় দশদিন কাটল। অথচ ধনভান্ডারের নামগন্ধও নেই, সন্ধানই মেলে না। জামাতুল্লাকে একদিন স্পষ্ট শাসালে–যদি টাকাকড়ির সন্ধান না মেলে তো তাকে এই জঙ্গলে টেনে আনবার মজা সে টের পাইয়ে দেবে।

জামাতুল্লা সুশীলকে গোপনে বললে–বাবুজি, ইয়ার হোসেন বদমাইস গুণ্ডা–ও না কী গোলমাল বাধায়।

সুশীল ও সনৎ সর্বদা সজাগ হয়ে থাকে রাত্রে, কখন কী হয় বলা যায় না। ইয়ার হোসেনের সশস্ত্র অনুচরের দল দিন-দিন অসংযত হয়ে উঠছে।

একদিন জামাতুল্লা, বনের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় একটি বড়ো পাথরের থাম আবিষ্কার করলে। থামের মাথায় ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে পদ্ম তৈরি করা হয়েছে। সুশীলকে ডেকে নিয়ে গেল জামাতুল্লা, সুশীল এসব দেখে খুশি হল।সুশীল ও সনৎ দু-জনে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে থামটা দেখতে গেল।

সেখানে গিয়েই সুশীল দেখলে থামটার সামনে আড়ভাবে পড়ে প্রকান্ড একটা পাথরের চাঙড়–যেন একখানা চৌরশ করা শানের মাঝে। সুশীল ক্যামেরা এনেছে থামটার ফোটো নেবে বলে, পাথরটা সরিয়ে না দিলে পদ্মটির ছবি নেওয়া সম্ভব না।

জামাতুল্লা বললে–পাথরখানা ধরাধরি করে এসো সরাই।

সরাতে গিয়ে পাথরখানা যেই কাত অবস্থা থেকে সোজা হয়ে পড়ল, অমনি সনৎ চিৎকার করে বললে–দেখো, দেখো–

সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, যেখানে পাথরটা ছিল, সেখানে একটা সুড়ঙ্গ যেন মাটির নীচে নেমে গিয়েছে। জামাতুল্লা ও সুশীল সুড়ঙ্গের ধারে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, সুড়ঙ্গটা হঠাৎ বেঁকে গিয়েছে, প্রথমটা সেজন্য মনে হয় গর্তটা নিতান্তই অগভীর।

সুশীল বললে–আমি নামব–

জামাতুল্লা বললে–তা কখনো করতে যাবেন না, বিপদে পড়বেন। কী আছে গর্তের মধ্যে কে জানে!

সুশীল বললে–নেমে দেখতেই হবে। আমি এখানে থাকি, তোমরা গিয়ে তাঁবু থেকে মোটা দড়ি হাত-চল্লিশ, টর্চ আর রিভলবার নিয়ে এসো। ইয়ার হোসেনকে কিছু বোলো না।

সব আনা হল। সুশীল জামাতুল্লা দু-জনে সুড়ঙ্গের মধ্যে নামলে। খানিক দূর নামলে ওরা। পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, পনেরো-ষোলো ধাপ নেমেই কিন্তু দু-জনে হতাশ হল দেখে, সামনে আর রাস্তা নেই। সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে, একটা গাঁথা দেওয়ালের সামনে।

সুশীল বললে–এর মানে কী জামাতুল্লা সাহেব?

বুঝলাম না বাবুজি। যদি যেতেই দেবে না, তবে সিঁড়ি গেঁথেছে কেন?

রাত হয়ে আসছে। ওরা দু-জনে টর্চ ফেলে চারিদিক ভালো করে দেখতে লাগল। হঠাৎ সুশীল চেঁচিয়ে উঠে বললে–দেখো, দেখো! দু-জনেই অবাক হয়ে দেখলে মাথার ওপরে পাথরের গায়ে ওদের পরিচিত সেই চিহ্ন খোদা–পদ্মরাগ মণির ওপর যে-চিহ্ন খোদা ছিল। ভারতীয় স্বস্তিক চিহ্ন, প্রত্যেক বাহুর কোণে এক-এক জানোয়ারের মূর্তি–সর্প, বাজপাখি, বাঘ ও কুমির।

এই সেই আঁক-জোঁক বাবুজি! কিন্তু এর মানে কী, সিঁড়ি বন্ধ করলে কেন, বুঝলেন কিছু?

দু-জনেই হতভম্ব হয়ে গেল। সুশীল সামনে পাথরখানাতে হাত দিলে, বেশ মসৃণ; মাপ নিয়ে চৌরশ করে কেটে কে তৈরি করে রেখেছে।

কিছুই বোঝা গেল না–অবশেষে হতাশ হয়ে ওরা গর্ত থেকে উঠে পড়ে তাঁবুতে ফিরে এল সনৎকে নিয়ে। সেখানে কাউকে কিছু বললে না। পরদিন দুপুর বেলা সুশীল একা জায়গাটায় গেল। আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে নামলে। ওর মনে একথা বিশেষভাবে জেগে ছিল, লোকে এইটুকু গর্তে ঢুকবার জন্যে এরকম সিঁড়ি গাঁথে না। এ সুড়ঙ্গ নিশ্চয় আরও অনেক বড়ো। কিন্তু তবে দশ ধাপ নেমেই পাথর দিয়ে এমন শক্ত করে বোজানো কেন?

এ গোলমেলে ব্যাপারের কোনো মীমাংসা করা যায় না দেখা যাচ্ছে। সুশীল চারিদিকে চেয়ে দেখলে মাথার ওপরে পাথরের গায়ে সেই অদ্ভুত চিহ্নটি সুস্পষ্ট খোদাই করা আছে। এ চিহ্নই বা এখানে কেন? ভালো করে চেয়ে চিহ্নটি দেখতে দেখতে ওর চোখে পড়ল, যে পাথরের গায়ে চিহ্নটি খোদাই করা তার এক কোণের দিকে আর একটা কী খোদাই করা আছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকার খুব না হলেও তেমন নয়। সুশীল টর্চ ফেলে ভালো করে দেখলে–চিহ্নটি আর কিছুই নয়, ঠিক যেন একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রাখবার সামান্য খোল। খোলের চারিপাশে দুটি লতার আকারের বলয় কিংবা অন্য কোনো অলংকার পরস্পর যুক্ত। সুশীল কী মনে ভেবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের খোলে নিজের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে দেখতে গেল।

সঙ্গেসঙ্গে সামনের পাথর যেন কলের দোরের মতো সরে একটা মানুষ যাবার মতো ফাঁক হয়ে গেল। সুশীল অবাক! এ যেন সেই আরব্য উপন্যাসের বর্ণিত আলিবাবার গুহা।

সে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে, সিঁড়ির পর সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে। সুশীল সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে উঁকি মেরে চাইলে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে। বহু যুগ আবদ্ধ দূষিত বাতাসের বিষাক্ত নিশ্বাস যেন ওর চোখে-মুখে এসে লাগল। তখনকিন্তু সুশীলের মন আনন্দে কৌতূহলে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, বসে ভাববার সময় নেই। ও তাড়াতাড়ি কয়েক ধাপ নেমে গেল।

আবার সিঁড়ি বেঁকে গিয়েছে কিছুদূর গিয়ে। এবার আর সামনে পাথর নেই, সিঁড়ি এঁকে বেঁকে নেমে চলেছে। সুশীল একবার ভাবলে তার আর যাওয়া উচিত নয়। কতদূর সিঁড়ি নেমেছে এই ভীষণ অন্ধকূপের মধ্যে কে জানে? কিন্তু কৌতূহল সংবরণ করা ওর

পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। ও আরও অনেকখানি নীচে নেমে গিয়ে দেখলে এক জায়গায় সিঁড়ি হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। টর্চ জ্বেলে নীচের দিকে ঘুরিয়ে দেখলে, কোনো দিকে কিছুই নেই–পাথর বাঁধানো চাতাল বা মেঝের মতো তলাটা সব শেষ, আর কিছু নেই। ইংরেজিতে যাকে বলে dead end ও সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। সুশীল হতভম্ব হয়ে গেল।

যারা এ সিঁড়ি গেঁথেছিল তারা কী জন্যে এত সতর্কতার সঙ্গে এত কষ্ট করে সিঁড়ি গেঁথেছিল যদি সে সিঁড়ি কোথাও না পৌঁছে দেয়।

চাতালের দৈর্ঘ্য হাত-তিনেক, প্রস্থ হাত আড়াই। খুব একখানা বড়ো পাথরের দ্বারা যেন সমস্ত মেঝে বা চাতালটা বাঁধানো। তন্ন-তন্ন করে খুঁজে চাতালের কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। সুশীল বাধ্য হয়ে বোকা বনে উঠে চলে এসে জামাতুল্লা ও সনৎকে সব বললে, ওরা পরদিন লুকিয়ে তিনজনে সেখানে গেল, সিঁড়ি দিয়ে নামলে। সামনে সেই চাতাল। সিঁড়ির শেষ।

জামাতুল্লা বললে–এ কী তামাশা আছে বাবুজি–আমি তো বেকুব বনে গেলাম!

তিন জনে মিলে নানা ভাবে পাথরটা দেখলে, এখানে টিপলে ওখানে চাপ দিলে–হিমালয় পর্বতের মতোই অনড়। কোথাও কোনো চিহ্ন নেই পাথরের গায়ে। মিনিট কুড়ি কেটে গেল। মিনিট কুড়ি সেই অন্ধকার ভূগর্ভে কাটানো বিপজ্জনকও বটে, অস্বস্তিকরও বটে।

সুশীল বললে–ওঠো সবাই, আর না এখানে।

হঠাৎ জামাতুল্লা বলে উঠল–বাবুজি, একটা কথা আমার মনে এসেছে!

দু-জনেই বলে উঠল–কী? কী?

গাঁতি দিয়ে এই পাথরখানা খুঁড়ে তুলে দেখলে হয়। কী বলেন?

তখন ওরাও ভাবলে এই সামান্য কথাটা। যে কথা, সেই কাজ। জামাতুল্লা লুকিয়ে তাঁবু থেকে গাঁতি নিয়ে এল। পাথর খুঁড়ে শাবলের চাড় দিয়ে তুলে ফেলে যা দেখলে তাতে ওরা যেমন আশ্চর্য হল তেমনি উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবার সিঁড়ির ধাপ। কিন্তু দশ ধাপ নেমে গিয়ে সিঁড়ি বেঁকে গেল–আবার সামনে চৌরশ পাথর দিয়ে সুড়ঙ্গ বোজানো। মাথার ওপরকার পাথরে পূর্ববৎ চিহ্ন পাওয়া গেল। বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে আবার সে পাথর ফাঁক হল। আবার সিঁড়ি। কিন্তু কিছুদূর নেমে আবার পাথর-বাঁধানো চাতাল–আবার সেই dead end, নির্দেশহীন শূন্য।

অমানুষিক পরিশ্রম। আবার পাথর তুলে ফেলা হল–আবার সিঁড়ি। সুশীল বললে, যারা এ গোলকধাঁধা করেছিল, তারা খানিকদূর গিয়ে একবার একখানা পাথর সোজা করে পথ বুজিয়েছে, তার পরেরটা সিঁড়ির মতো পেতে বুজিয়েছে–এই এদের কৌশল, বেশ বোঝা যাচ্ছে। জামাতুল্লা ওদের সতর্ক করে দিলে–বললে–বাবুজি, অনেকটা নীচে নেমে এসেছি। খারাপ গ্যাস থাকতে পারে, দমবন্ধ হয়ে মারা যেতে পারি সবাই। তাঁবুতেও সন্দেহ করবে। চলুন আজ ফিরি।

তাঁবুতে ফেরবার পথে জামাতুল্লা বললে–বাবুজি, ইয়ার হোসেনকে এর খবর দেবেন না।

কেন?

কী জানি কী আছে ওর মধ্যে। যদি রত্নভান্ডারের সন্ধানই পাওয়া যায়, তবে ইয়ার হোসেন কী করবে বলা যায় না। ওর সঙ্গে তোক বেশি। প্রত্যেকে গুণ্ডা ও বদমাইশ। মানুষ খুন করতে ওরা এতটুকু ভাববে না। ওদের কাছে মশা টিপে মারাও যা, মানুষ মারাও তাই।

ইয়ার হোসেনের মন যথেষ্ট সন্দিগ্ধ। তাঁবুতে ফিরতে সে বললে– কোথায় ছিলে তোমরা?

সুশীল বললে–ফোটো নিচ্ছিলাম।

ইয়ার হোসেন হেসে বললে–ফোটো নিয়ে কী হবে, যার জন্যে এত কষ্ট করে আসা–তার সন্ধান করো।

ইয়ার হোসেনের জনৈক মালয় অনুচর সেদিন দুপুরে একটা পাথরের বৃষমূর্তি কুড়িয়ে পেলে গভীর বনের মধ্যে। খুব ছোটো, কিন্তু অতটুকু মূর্তির মধ্যেও শিল্পীর শিল্পকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় বর্তমান।

রাত্রে জ্যোৎস্না উঠল।

সুশীল তাঁবু থেকে একটু দূরে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসল। ভাবতে ভালো লাগে এই সমুদ্রমেখলা দ্বীপময় রাজ্যের অতীত গৌরবের দিনের কাহিনি। রাত্রে যামঘোষী দুন্দুভি যেন বেজে উঠল–ধারাযন্ত্রে স্নান সমাপ্ত করে, কুঙ্কুমচন্দনলিপ্ত দেহে দিগবিজয়ী নৃপতি চলেছেন অন্তপুরের অভিমুখে। বারবিলাসিনীরা তাঁকে স্নান

করিয়ে দিয়েছে এইমাত্র– তারাও ফিরছে তাঁর পিছনে পিছনে, কারো হাতে রজত কলস, কারো হাতে স্ফটিক কলস…

আধো-অন্ধকারে কালো মতো কে একটা মানুষ বনের মধ্যে থেকে বার হয়ে সুশীলের দিকে ছুটে এল আততায়ীর মতো–সুশীল চমকে উঠে একখানা পাথর ছুঁড়ে মারল। মানুষটা পড়েই জানোয়ারের মতো বিকট চিৎকার করে উঠল–তারপর আবার উঠে আবার ছুটল ওর দিকে। সুশীল ছুট দিলে তাঁবুর দিকে।

ওর চিৎকার শুনে তাঁবু থেকে সনৎ বেরিয়ে এল। ধাবমান জিনিসটাকে সে গুলি করলে। সেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দেখা গেল একটা ওরাংওটাং।

জামাতুল্লা ও ইয়ার হোসেন দু-জনে তিরস্কার করলে সুশীলকে।

এই বনে যেখানে-সেখানে একা যাওয়া উচিত নয়, তারা কতবার বলবে একথা? কত জানা-অজানা বিপদ এখানে পদে পদে!

পরদিন ছুতো করে সুশীল ও জামাতুল্লা আবার বেরিয়ে গেল। বনের মধ্যে সেই গুহায়। সনৎকে সঙ্গে নিয়ে গেল না। কেননা সকলে গেলে সন্দেহ করবে ওরা।

আবার সেই পরিশ্রম। আরও দু-ধাপ সিঁড়ি ও দুটো চাতাল ওরা ডিঙিয়ে গেল। দিন শেষ হয়ে গেল, সেদিন আর কাজ হয় না। আবার তার পরের দিন কাজ হল শুরু। এইরকম আরও তিন-চার দিন কেটে গেল।

একদিন সনৎ বললে–দাদা, তোমরা আর সেখানে দিনকতক যেও না।

সুশীল বললে–কেন?

ইয়ার হোসেন সন্দেহ করছে। সে রোজ বলে, এরা বনের মধ্যে কী করে? এত ফোটো নেয় কীসের?

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আর একদিনের কাজ বাকি। ওর শেষ না দেখে আমি আসতে পারছি নে।

একা যাও–দু-জনে যেও না। জোট বেঁধে গেলেই সন্দেহ করবে। হাতিয়ার নিয়ে যেও।

তুই তাঁবুতে থেকে নজর রাখিস ওদের ওপর। কাল খুব সকালে আমি বেরিয়ে যাব।

সুশীল তাই করলে। প্রায় ষাট ফুট নীচে তখন শেষ চাতাল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। সেদিন দুপুর পর্যন্ত পরিশ্রম করে সে চাতালটা ভেঙে ফেললে।

তারপর যা দেখলে তাতে সুশীল একেবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও হতভম্ভ হয়ে পড়ল।

সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে ক্ষুদ্র একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে।

কক্ষের মধ্যে অন্ধকার সূচিভেদ্য।

টর্চের আলোয় দেখা গেল কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটি পাষাণবেদিকার ওপর এক পাষাণ নারীমূর্তি– বিলাসবতী কোনো নর্তকী যেন নাচতে নাচতে হঠাৎ বিটঙ্কবেদিকার ওপর পুত্তলিকার মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে কী দেখে।

একী!

এর জন্যে এত পরিশ্রম করে এরা এসব কান্ড করেছে!

সুশীল আরও অগ্রসর হয়ে দেখতে গেল।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। পাথরের বেদির ওপর সেই চিহ্ন আবার খোদাই করা। ঘরের মধ্যে টর্চ ঘুরিয়ে দেখলে। তাকে ঘর বলা যেতে পারে, একটা বড়ো চৌবাচ্চাও বলা যেতে পারে। স্যাঁৎসেঁতে ছাদ, স্যাঁৎসেঁতে মেঝে–পাতালপুরীর এই নিভৃত অন্ধকার গহ্বরে এ প্রস্তরময়ী নারী-মূর্তির রহস্য কে ভেদ করবে?

কিন্তু কী অদ্ভুত মূর্তি! কটিতে চন্দ্রহার, গলদেশে মুক্তামালা, প্রকোষ্ঠে মণিবলয়। চোখের চাহনি সজীব বলে ভ্রম হয়।

সেদিনও ফিরে গেল। জামাতুল্লাকে পরদিন সঙ্গে করে নিয়ে এল–তন্ন-তন্ন করে চারিদিক খুঁজে দেখলে ঘরের কোথাও কিছু নেই।

জামাতুল্লা বললে–কী মনে হয় বাবুজি?

তোমার কী মনে হয়?

এই সিঁড়ি আর চাতাল, চাতাল আর সিঁড়ি ষাট ফুট গেঁথে মাটির নীচে শেষে নাচনেওয়ালি পুতুল! ছো: বাবুজি–এর মধ্যে আর কিছু আছে।

বেশ, কী আছে, বার করো। মাথা খাটাও।

তা তো খাটাব–এদিকে ইয়ার হোসেনের দল যে খেপে উঠেছে। কাল ওরা কী বলেছে জানেন?

কীরকম?

আর দু-দিন ওরা দেখবে–তারপর বাকি এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে। তা ছাড়া আর এক ব্যাপার। আপনাকেও ওরা সন্দেহ করে। বনের মধ্যে রোজ আপনি কী করেন? আমায় প্রায়ই জিজ্ঞেস করে।

তুমি কী বল?

আমি বলি বাবুজি ফোটো তোলে, ছবি আঁকে। তাতে ওরা আপনাকে ঠাট্টা করে। ওসব মেয়েলি কাজ।

যারা এই নগর গড়েছিল, পুতুল তৈরি করেছিল, পাথরে ছবি এঁকেছিল–তারা পুরুষ মানুষ ছিল জামাতুল্লা। ইয়ার হোসেনের চেয়ে অনেক বড়ো পুরুষ ছিল–বলে দিও তাকে।

সুশীলকে রেখে জামাতুল্লা ফিরে যেতে চাইলে। নতুবা ইয়ার হোসেনের দল সন্দেহ করবে। যাবার সময় সুশীল বললে–কোনো উপায়ে এখানে একটা আলোর ব্যবস্থা করতে পার? টর্চ জ্বালিয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? আর কিছু না থাক সাপের ভয়ও তো আছে।

জামাতুল্লা বললে–আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি লণ্ঠন নিয়ে বাবুজি। আপনি ওপরে উঠে বসুন, এ পাতালের মধ্যে একা থাকবেন না–

সুশীল বললে–না, তুমি যাও–আমি এখানেই থাকব। পকেটে একটুকরো মোমবাতি এনেছি–তাই জ্বালাব।

একটুকরো বাতি জ্বালিয়ে সুশীল ঘরটার মধ্যে বসে ভাবতে লাগল। বাইরে এত বড়ো রাজ্য যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল, কোন জিনিস গোপন করবার জন্যে তারা এই পাতালপুরী তৈরি করেছিল, এত কষ্ট স্বীকার করে নর্তকীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে নয় নিশ্চয়ই।

হঠাৎ নর্তকী পুতুলটার দিকে ওর দৃষ্টি পড়তে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কী ব্যাপার এটা?

এতক্ষণ মূর্তিটার যতখানি তার দিকে ছিল, সেটা যেন সামান্য একটু পাক খেয়ে খানিকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

সুশীল চোখ মুছে আবার চাইলে।

হ্যাঁ, সত্যিই তাই। এই বাতিটার সামনে ছিল ওই পা-খানা–এখন পায়ের হাঁটুর পেছনের অংশ দেখা যায় কী করে? সে তো অতটুকু নড়েনি নিজে, যেখানে, সেখানেই বসে আছে।

সুশীলের ভয় হল। শ্মশানপুরীর ভূগর্ভস্থ কক্ষ, কত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দৈত্যদানোর দল জমা হয়ে আছে এসব জায়গায় কে বলতে পারে? কীসে মৃত্যু আর কীসে জীবন, এ বার্তা পোঁছে দেবার লোক নেই। সরে পড়াই ভালো।

এমন সময় ওপর থেকে লণ্ঠনের আলো এসে পড়ল, পায়ের শব্দ শোনা গেল। জামাতুল্লা লণ্ঠন নিয়ে ঘরের মধ্যে ওপর থেকে উঁকি মেরে বললে–বাবুজি, ঠিক আছেন?

তা আছি। ঘরের মধ্যে নামো জামাতুল্লা—

জামাতুল্লা ঘরের মেঝেতে নেমে ওর পাশে দাঁড়াল। সুশীল ওকে মূর্তির ব্যাপারটা দেখিয়ে বললে–এখন তুমি কী মনে কর?

কিছু বুঝতে পারছি নে বাবুজি-খুব তাজ্জব কথা!

তুমি থাকো এখানে–বোসো—

কিন্তু জামাতুল্লা দাঁড়াল না। দু-জনে এখানে বসে থাকলে ইয়ার হোসেনের দলের সন্দেহ ঘোরালোরকম হয়ে উঠবে, সে থাকতে পারবে না। জামাতুল্লা চলে যাবার পর সুশীল অনেকক্ষণ মূর্তিটার দিকে চেয়ে বসে রইল। মূর্তিটা এবার বেশ ঘুরে গিয়েছে, এ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ওর আগের ভয়ের ভাবটা কেটে গিয়েছিল জামাতুল্লা লণ্ঠন নিয়ে আসার পর থেকে, এখন ভয়ের চেয়ে কৌতূহল বেশি!

খুব একটু একটু করে ঘুরছে, ঘূর্ণমান রঙ্গমঞ্চের মতোই, মূর্তির পদতলস্থ বিটঙ্কবেদিকা।

কেন? কী উদ্দেশ্য? অতীত শতাব্দীগুলি মূক হয়ে রইল, এর জবাব মেলে না। বেলা গড়িয়ে এল, সুশীলের হাতঘড়িতে বাজে পাঁচটা।

হঠাৎ সুশীল চেয়ে দেখলে আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার।

নর্তকী-মূর্তির সরু সরু আঙুলগুলির মধ্যে একটা আঙুল একটি মুদ্রা রচনা করার দরুন অন্য সব আঙুল থেকে পৃথক এবং একদিকে কী যেন নির্দেশ করবার ভঙ্গিতে ছিল। এবার যেন আঙুলের ছায়া পড়েছে দেওয়ালের এক বিশেষ স্থানে।

এমন ভঙ্গিতে পড়েছে যেন মনে হয় মূর্তিটি তর্জনী-অঙ্গুলির দ্বারা ভিত্তিগাত্রের একটি স্থান নির্দেশ করছে।

তখনি একটা কথা মনে হল সুশীলের। লণ্ঠনের আলোর দ্বারা এ ছায়া তৈরি হয়েছে, না কোনো গুপ্ত ছিদ্রপথে দিবালোক প্রবেশ করেছে ঘরের মধ্যে?

তা-ই বলে মনে হয়, লণ্ঠনের আলোর কৃত্রিম ছায়া ও নয়। ও লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দিয়ে দেখলে–তখন অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারের মধ্যেও তর্জনীর ছায়া ভিত্তিগাত্রে পড়ে একটা স্থান যেন নির্দেশ করছে।

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে উঠে ও জায়গাটা দেখতে গেল।

দেওয়ালের সেই জায়গা একেবারে সমতল, চিহ্নহীন–চারিপাশের অংশের সঙ্গে পৃথক করে নেওয়ার মতো কিছুই নেই সেখানে। তবুও সে নিরাশ না হয়ে দেওয়ালের সেই জায়গাটাতে হাত বুলিয়ে দেখতে গেল।

হাত দেবার সঙ্গেসঙ্গে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। ঠিক যেখানে আঙুলের অগ্রভাগ শেষ হয়েছে সেই স্থানের খানিকটা যেন বসে গেল–অর্থাৎ ঢুকে গেল ভেতরের দিকে। একটা শব্দ হল পেছনের দিকেও পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে বিটঙ্কবেদিকার তলাটা যেন ঈষৎ ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

ও ফিরে এসে ভালো করে লক্ষ করে দেখলে, গোলাকার বেদিকাটি তার নর্তকী-মূর্তিটাসুদ্ধ যেন একটা পাথরের ছিপি। বড়ো বোতলের মুখে যেমন কাঁচের স্টপার বা ছিপি থাকে, এ যেন পাষাণ-নির্মিত বিরাট এক স্টপার। কীসের চাড় লেগে স্টপারের মুখ ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

ও নর্তকীমূর্তির পাদদেশে এবং গ্রীবায় দুই হাত দিয়ে মূর্তিটাকে একটু ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই সেটা সবসুদ্ধ বেশ আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল। কয়েকবার ঘোরবার

পরে ক্রমেই তার তলার ফাঁক চওড়া হয়ে আসতে লাগল। কী কৌশলে প্রাচীন শিল্পী পাথরের উপরটাকে ঘূর্ণমান করে তৈরি করেছিল?

এই মূর্তিসুদ্ধ বেদিকা টেনে তোলা তার একার সাধ্যে কুলবে না। জামাতুল্লা ও সনৎ দু জনকেই আনতে হবে কোনো কৌশলে সঙ্গে করে, ইয়ার হোসেনের দলের অগোচরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার বিলম্ব নেই। বহু দিন-রাত্রির ছায়া অতীতের এনিস্তব্ধ কক্ষে জীবনের সুর ধ্বনিত করেনি, এখানে গভীর নিশীথ রাত্রির রহস্য হয়তো মানুষের পক্ষে খুব আনন্দদায়ক হবে না, মানুষের জগতের বাইরে এরা।

সুশীল লণ্ঠন হাতে উঠে এল আঁধার পাতালপুরীর কক্ষ থেকে। তাঁবুতে ঢোকবার পথে ইয়ার হোসেন বড়ো ছুরি দিয়ে পাখির মাংস ছাড়াচ্ছে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে–কোথায় ছিলেন?

ছবি আঁকতে, মি. হোসেন।

লণ্ঠন কেন?

পাছে রাত হয়ে যায় ফিরতে। বনের মধ্যে আলো থাকলে অনেক ভালো।

এত ছবি এঁকে কী হয় বাবু?

ভালো লাগে।

আসল ব্যাপারের কী? জামাতুল্লা আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। আমি ওকে মজা দেখিয়ে দেব! আমরা সকলেই চেষ্টা করছি! ব্যস্ত হবেন না মি. হোসেন–

আমি আর পাঁচদিন দেখব। তারপর এখান থেকে চলে যাব–কিন্তু যাবার আগে জামাতুল্লাকে দেখিয়ে যাব সে কার সঙ্গে জুয়েচুরি করতে এসেছিল!

জামাতুল্লার কী দোষ? আপনি বরং আমাকে দোষ দিতে পারেন—

আরে আপনি তো ছবি-আঁকিয়ে পুরুষ মানুষ। এসব কাজ আপনার না।

সুশীল রাত্রে চুপি চুপি জামাতুল্লাদের নর্তকী পুতুলের ঘটনা সব বললে। ওদের দুজনকেই যেতে হবে, নতুবা ছিপি উঠবে না।

জামাতুল্লা বললে–কিন্তু আমাদের দুজনের একসঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয় বাবুজি।

কেন?

জানেন না,–এর মধ্যে নানারকম ষড়যন্ত্র চলছে। ওরা আপনাদের চেয়ে আমাকেই দোষ দেবে বেশি। আপনাকে ওরা নিরীহ, গোবেচারি বলে ভাবে–

সেটা অন্যায়।

আপনারা ভালো মানুষ, আমার হাতের পুতুল–পুতুল যেমন নাচায়, তেমনি আপনারা আমার হাতে—

শেষের কথাটা শুনে সুশীলের আবার মনে পড়ল নর্তকীমূর্তির কথা। কাল হয়তো বেরোনো যাবে না, ইয়ার হোসেনের কড়া নজরবন্দির দরুন। আজই রাত্রে অন্য দল ঘুমোলে সেখানে গেলে ক্ষতি কী?

সনৎকে বললে–সনৎ, তৈরি হও। আজ রাত্রে হয় আমাদের জীবন, নয়তো আমাদের মরণ। পাতালপুরীর রহস্য আজ ভেদ করতেই হবে। আজ আঁধার রাত্রে চুপি চুপি বেরোবে আমার সঙ্গে–দিনের আলোয় সব ফাঁস হয়ে যাবে।

জামাতুল্লা বললে–কেউ টের না পায় বাবুজি, জুতো হাতে করে সব যাবেন কিন্তু।

আহারাদির পর্ব মিটে গেল। দাবানল জ্বলে উঠেছে আজ ওদের মনে, বনের সাময়িক দাবানলকেও ছাপিয়ে তার শিখা সমস্ত মনের আকাশ ব্যেপে বেড়ে উঠল।

দুটো রাইফেল, একটা রিভলবার, একটা শাবল, একটা গাঁতি, খনিকটা দড়ি, চার-পাঁচটা মোমবাতি, কিছু খাবার জল, এক শিশি টিংচার আইডিন, খানকতক মোটা রুটি–তিনজনের মধ্যে এগুলি ভাগ করে নিয়ে রাত একটার পরে ওরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তাঁবু থেকে বেরোলো।

ইয়ার হোসেনের একজন মালয় অনুচর উলটো মুখে দাঁড়িয়ে বলো রামদাও হাতে পাহারা দিচ্ছে। অন্ধকারে এরা বুক ঘেঁষে চলে এল… সে লোকটা টের পেলে না।

সনৎ বললে–আমি সে পুতুলটা একবার দেখব–

অদ্ভুত রাত্রি! বনের মাথায় মাথায় অগণিত তারা, বহুকালের সুপ্ত নগরীর রহস্যে নিশীথ রাত্রি অন্ধকার যেন থমথম করছে, সমস্ত ধ্বংসস্তূপটি যেন মুহূর্তে শহর হয়ে

উঠতে পারে– ওর অগণিত নর-নারী নিয়ে। লতাপাতা, ঝোঁপঝাঁপ, মহীরুহের দল খাড়া হয়ে সেই পরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় যেন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

অন্ধকারে একটা সর-সর শব্দ হতে লাগল সামনের মাটিতে।

সকলে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। সনৎ ও সুশীল একসঙ্গে টর্চ টিপলে–প্রকান্ড একটা অজগর সাপ আস্তে আস্তে ওদের পাঁচ হাত তফাত দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলে পাথরের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল, সাপটা বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ওরা আবার চলল।

গহ্বরের মুখ ওরা লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখে গিয়েছিল, তিনজনে মিলে সেগুলি সরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল।

সনৎ বললে–এ তো বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি–

কিন্তু পাতালপুরীর কক্ষের সে-নর্তকীমূর্তিটি দেখে ওর মুখে কথা সরল না। শিল্পীর অদ্‌ভুত শিল্পকৌশলের সামনে ও যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

সুশীল বললে–শুধু এই মূর্তিটি কিউরিও হিসেবে বিক্রি করলে দশহাজার টাকায় যেকোনো বড়ো শহরের মিউজিয়াম কিনে নেবে–তবে, আমাদের দেশে নয়–ইউরোপে।

জামাতুল্লা বললে–ধরুন বাবুজি নাচনেওয়ালি পুতুলটা সবাই মিলে–পাক খাওয়াতে হবে একে বারকয়েক এখনও।

মিনিট দুই সবাই মিলে পাক দিয়ে মূর্তিটাকে ঘোরালো যেমন স্টপার ঘোরায় বোতলের মুখে। তারপর সবাই সন্তর্পণে মূর্তিটাকে ধরে উঠিয়ে নিলে। স্টপারের মতোই সেটা খুলে এল।

সঙ্গেসঙ্গে বিটঙ্কবেদির নীচের অংশে বার হয়ে পড়ল গোলাকার একটা পাথরের চৌবাচ্চা। সুশীল উঁকি মেরে দেখে বললে–টর্চ ধরো, খুব গভীর বলে মনে হচ্ছে—

টর্চ ধরে ওরা দেখলে চৌবাচ্চা অন্তত সাত ফুট গভীর। তার তলায় কী আছে ওপর থেকে ভালো দেখা যায় না।

সনৎ বললে–আমি লাফ দিয়ে পড়ব দাদা?

জামাতুল্লা বারণ করলে। এসব পুরোনো কূপের মধ্যে বিষধর সর্প প্রায়ই বাসা বাঁধে, যাওয়া সমীচিন হবে না।

দু-একটি পাথর ছুঁড়ে মেরে ওরা দেখলে, কোনো সাড়াশব্দ এল না আধো-অন্ধকার কূপের মধ্যে থেকে। তখন জামাতুল্লাই ধুপ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ওর মধ্যে।

কিছুক্ষণ তার আর কোনো সাড়া নেই।

সুশীল ও সনৎ অধীর কৌতূহলের সঙ্গে বলে উঠল–কী–কী–কী দেখলে?

তবুও জামাতুল্লার মুখে কথা নেই। সে যেন কী হাতড়ে বেড়াচ্ছে চৌবাচ্চার তলায়। একটু অদ্‌ভুতভাবে হাতড়াচ্ছে–একবার সামনে যাচ্ছে, আবার পিছু হঠে আসছে।

সুশীল বললে–কী হল হে? পেলে কিছু দেখতে?

জামাতুল্লা বললে–বাবুজি, এর মধ্যে কিছু নেই—

কিছু নেই?

না বাবুজি। একেবারে ফাঁকা—

তবে তুমি ওর মধ্যে কী করছ জামাতুল্লা?

এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। নেমে এসে দেখুন—

সুশীল ও সনৎ সন্তর্পণে একে একে পাথরের চৌবাচ্চাটির মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। জামাতুল্লা দেখালে–এই দেখুন বাবুজি, এই লাইন ধরে একেবার সামনে, একেবার পেছনে গিয়ে দেখুন–তা হলেই বুঝতে পারবেন—

সামনে-পেছনে গিয়ে কী হবে?

সুশীল লক্ষ করে দেখলে চৌবাচ্চার ডানদিকের দেওয়ালে একটা কালো রেখা আছে সেইটে ধরে যদি সামনে বা পেছনে যাওয়া যায় তবে চৌবাচ্চার তলাটা একবার নামে, একবার ওঠে। ছেলেদের see-saw খেলার তক্তাটার মতো।

সনৎ বললে–ব্যাপারটা কী?

সুশীল বললে–অর্থাৎ এটা যদি কোনোরকমে ওঠানো যায়, তবে এর মধ্যে আর কিছু রহস্য আছে। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

জামাতুল্লা বললে–বাবু, গাঁতি দিয়ে তলা ভেঙে ফেলতে পারি তো–অন্য কোনো পথ যদি না পাওয়া যায়। কিন্তু আজ থাকলে হত না বাবুজি? বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ–সকাল হয় হয়—

হঠাৎ সুশীল চৌবাচ্চার এক জায়গায় টর্চের আলো ফেলে বলে উঠল–এইদেখো সেই চিহ্ন–

সনৎ ও জামাতুল্লা সবিস্ময়ে দেখলে, চৌবাচ্চার কালো রেখার ওপরে উত্তর দিকের

কোণে, দু-খানা পাথরের সংযোগস্থলে তাদের অতিপরিচিত সেই চিহ্নটি আঁকা।

সুশীল বললে–হদিশ পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে–

অর্থাৎ

অর্থাৎ এই চিহ্নের ওপর টিপলেই চৌবাচ্চার তলার পাথরখানা একদিকে খুব বেশি কাত হয়ে, ভেতরে কী আছে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল। আজ থাক, চলো।

জামাতুল্লা তাতে মত দিলে। সবাই মিলে তাঁবুতে ফিরে এল যখন, তখনও ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি। ইয়ার হোসেনের মালয় ভৃত্য বলো হাতে তাঁবুর দ্বারে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। জামাতুল্লার ইঙ্গিতে সুশীল ও সনৎ উপুড় হয়ে পড়ে বুকে হেঁটে নিজেদের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

জামাতুল্লা বললে–ঘুমিয়ে পড়ন বাবুজিরা–কিন্তু বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমোবেন না, আমি উঠিয়ে দেব সকালেই। নইলে ওরা সন্দেহ করবে।

সুশীল বললে–আমাদের অবর্তমানে ওরা ঘরে ঢোকেনি এই রক্ষে—

সনৎ অবাক হয়ে বললে–কী করে জানলে দাদা?

দেখবে? এই দ্যাখো। তাঁবুর দোরে সাদা বালি ছড়ানো, যে-কেউ এলে পায়ের দাগ পড়ত। তা পড়েনি।

ওরা যে যার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * * *

সুশীলকে কে বললে–আমার সঙ্গে আয়।

গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষের পিছু পিছু ও গভীর বনের কতদূর চলল। ইয়ার হোসেনের মালয় ভৃত্যগণ ঘোর তন্দ্রাভিভূত, ঊষার আলোকের ক্ষীণ আভাসও দেখা যায় না পূর্বদিগন্তে। বৃক্ষলতা স্তব্ধ, স্বপ্নঘোরে আচ্ছন্ন। সারি সারি প্রাসাদ এক দিকে, অন্য দিকে প্রশস্ত দীর্ঘিকার টলটলে নির্মল জলরাশির বুকে পদ্ম ফুল ফুটে আছে। সেই গভীর বনে, গভীর অন্ধকারের মধ্যে দেউলে দেউলে ত্রিমূর্তি মহাদেবের পূজা হচ্ছে। সুগন্ধ দীপবর্তিকার আলোকে মন্দিরাভ্যন্তর আলোকিত। প্রাসাদের বাতায়ন বলভিতে শুকসারী তন্দ্রামগ্ন।

সুশীল বললে–আমায় কোথা নিয়ে যাবেন?

সে কথা বলব না। ভয় পাবি—

তবুও শুনি, বলুন–

বহুদিনের বহু ধ্বংস, অভিশাপ, মৃত্যুর দীর্ঘশ্বাসে এ পুরীর বাতাস বিষাক্ত, এখানে প্রবেশ করবার দুঃসাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু এর মূল্য দিতে হবে।

কী?

একজনের প্রাণ। সমুদ্রমেখলা এ দ্বীপের বহু শতাব্দীর গুপ্ত কথা ঘন বন ঢেকে রেখেছিল। ভারত মহাসমুদ্র স্বয়ং এর প্রহরী, দেখতে পাও না?

আজ্ঞে, তা দেখছি বটে।

তবে সে-রহস্য ভেদ করতে এসেছ কেন?

আপনি তো জানেন সব।

সম্রাটের ঐশ্বর্য গুপ্ত আছে এর মধ্যে। কিন্তু সে পাবে না। যে অদৃশ্য আত্মারা তা পাহারা দিচ্ছে, তারা অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত হিংসুক। কাউকে তারা নিতে দেবে না। তবে তুমি ভারতবর্ষের সন্তান, তোমাকে একেবারে বঞ্চিত করব না আমি–রহস্য নিয়ে যাও, অর্থ পাবে না। যা পাবে তা সামান্য। তারই জন্যে প্রাণ দিতে হবে।

আপনি বিশ্বামুনি?

মুখ! আমি এই নগরীর অধিদেবতা। ধ্বংসস্তূপ পাহারা দিচ্ছি শতাব্দীর পর শতাব্দী। অনেকদিন পরে তুমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছ–আটশো বছর আগে তোমাদের সাহসী পূর্বপুরুষরা অস্ত্র হাতে এখানে এসে রাজ্যস্থাপন করেন। দুর্বল হাতে তাঁরা খড়গ ধরতেন না। তোমরা সে-দেশ থেকেই এসেছ কি? দেখলে চেনা যায় না কেন?

সেটা আমাদের অদৃষ্টের দোষ, আমাদের ভাগ্যলিপি।

তারপরেই সব অন্ধকার। সুশীল সেই অদৃষ্টপূর্ব পুরুষের সঙ্গে সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন চলেছে..চলেছে...মাথার ওপর কৃষ্ণা নিশীথিনীর জ্বলজ্বলে নক্ষত্রভরা আকাশ।

পুরুষটি বললেন–সাহস আছে? তুমি ভারতবর্ষের সন্তান—

নিশ্চয়ই দেব।

নগরী বহুদিন মৃতা, কিন্তু বহু যুগের পুরাতন কৃষ্ণাগুরুর ধূপগন্ধে আমোদিত অরণ্যতরুর ছায়ায় ছায়ায় অজানা পথযাত্রার যেন শেষ নেই।

বিশাল পুরী, প্রেতপুরীর সমান নিস্তব্ধ। রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত কক্ষে, দামি নীলাংশুকের আস্তরণে ঢাকা স্বর্ণ-পর্যঙ্ক কোন অপরিচিতের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। সুশীলের বুক গুরুগুরু করে উঠল, গৃহের রত্নপ্রস্তরের ভিত্তিতে যেন অমঙ্গলের লেখা। ভবনদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে উঠবে এখনি যেন কোন বিভীষণা অপদেবীর বিকট মূর্তি!

পুরুষ বললেন–ওই শোনো–

সুশীল চমকে উঠল। যেন কোন নারীকন্ঠের শোকার্ত চিৎকারে নিশীথ নগরীর নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। সে-নারীর কণ্ঠস্বরকে সে চেনে। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর! খুব নিকট আত্মীয়ার বিলাপধ্বনি। সুশীলের বুক কেঁপে উঠল। ঠিক সেইসময় বাইরে থেকে কে ডাকলে–বাবুজি–বাবুজি–

তার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ঘামে ভেসে গিয়েছে। জামাতুল্লা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে। দিনের আলো ফুটছে তাঁবুর বাইরে।

জামাতুল্লা বললে–উঠুন বাবুজি।

সুশীল বিমূঢ়ের মতো বললে–কেন?

ভোর হয়েছে। ইয়ার হোসেনের লোক এখনো ওঠেনি–আমাদের কেউ কোনো সন্দেহ না করে। সনৎবাবুকে ওঠাই—

একটু বেলা হলে ইয়ার হোসেন উঠে ওদের ডাকলে। বললে–পরশু এখান থেকে তাঁবু ওঠাতে হবে। জাঙ্কওয়ালা চীনেম্যান আমার নিজের লোক। ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর থাকতে চাইছে না। এখানে আপনারা এলেন ফোটো তুলতে আর ছবি আঁকতে এত পয়সা খরচ এর জন্যে করিনি।

সুশীল বললে–যা ভালো বোঝেন মি. হোসেন।

সনৎ বললে–তাহলে দাদা, আমাদের সেই কাজটা এই দু-দিনের মধ্যে সারতে হবে। ইয়ার হোসেন সন্দেহের সুরে বললে–কী কাজ?

সুশীল বললে–বনের মধ্যের একটা মন্দিরের গায়ে পাথরের ছবি আছে, সেটা আমি আঁকছি। সনৎ ফোটো নিচ্ছে তার।

ইয়ার হোসেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললে–ওই করতেই আপনারা এসেছিলেন আর কী! করুন যা হয় এই দু-দিন।

সনৎ বললে–তাহলে চলো দাদা আমরা সকাল সকাল খেয়ে রওনা হই।

ইয়ার হোসেনের অনুমতি পেয়ে ওদের সাহস বেড়ে গেল। দিন দুপুরেই ওরা দুজন রওনা হয়ে গেল–শাবল, গাঁতি, টর্চ ওরা কিছুই আনেনি, সিঁড়ির মুখের প্রথম ধাপে রেখে এসেছে। শুধু ক্যামেরা আর রিভলবার হাতে বেরিয়ে গেল।

জামাতুল্লা গোপনে বললে–আমি কোন ছুতোয় এরপরে যাব। একসঙ্গে সকলে গেলে চালাক ইয়ার হোসেন সন্দেহ করবে। আজ কাজ শেষ করতে হবে মনে থাকে যেন, হয় এসপার নয়তো ওসপার। আর সময় পাব না।

সনৎ বললে–মনে থাকে যেন একথা। আজ আর ফিরব না শেষ না দেখে।

সুশীলের বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল সনতের কথায়। সনতের মুখের দিকে ও চাইলে। কেন সনৎ হঠাৎ এ কথা বললে?

আবার সেই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে রহস্যময় গহ্বরে সুশীল ও সনৎ এসে দাঁড়াল। আসবার সময় সিঁড়ির প্রথম ধাপ থেকে ওরা গাঁতি ও টর্চ নিয়ে এসেছে। পাথরে নর্তকীমূর্তি দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় কাত করে রাখা হয়েছে। যেন জীবন্তপুরী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়। সুশীল সে-দিকে চেয়ে বললে–আর কিছু না পাই, এই পুতুলটা নিয়ে যাব। সব খরচ উঠে এসেও অনেক টাকা লাভ থাকবে–শুধু ওটা বিক্রি করলে।

তারপর দু-জনে নীচের পাথরের চৌবাচ্চাটাতে নামল।

সনৎ বললে–উত্তর কোণের গায়ে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ দাদা!

—এখন কিছু কোরো না, জামাতুল্লাকে আসতে দাও।

সনৎ ছেলেমানুষ, সে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে জন্মগ্রহণ করে একদিন যে জীবনে এমন একটা রহস্যসংকুল পথযাত্রায় বেরিয়ে পড়বে, কবে সে একথা ভেবেছিল? সুশীল কিন্তু বসে বসে অন্য কথা ভাবছিল।

গত রাত্রের স্বপ্নের কথা তার স্পষ্ট মনে নেই, আবছাভাবে যতটুকু মনে আছে, সে যেন গতরাত্রে এক অদ্ভুত রহস্যপুরীর পথে পথে কার সঙ্গে অনির্দেশ যাত্রায় বার হয়েছিল, কত কথা যেন সে বলেছিল, সব কথা মনে হয় না। তবুও যেন কী এক অমঙ্গলের বার্তা সে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছে, কী সে বার্তা, কার সে অমঙ্গল কিছুই স্পষ্ট মনে নেই–অথচ সুশীলের মন ভার ভার, আর যেন তার উৎসাহ নেই। এ কাজে ফিরবার পথও তো নেই।

ওপরের ঘর থেকে জামাতুল্লা উঁকি মেরে বললে–সব ঠিক।

এসেছ?

হাঁ বাবুজি। অনেকটা দড়ি এনেছি লুকিয়ে–

নেমে পড়ো।

আপনার ক্যামেরা এনেছেন?

কেন বল তো?

ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি দিতে হলে ক্যামেরাতে ফোটো তুলে নিয়ে যেতে হবে—

সব ঠিক আছে।

জামাতুল্লা ওদের সঙ্গে এসে যোগ দেবার অল্পক্ষণ পরেই সনৎ হঠাৎ কী ভেবে দেওয়ালের উত্তর কোণের সে চিহ্নটা চেপে ধরলে এবং সঙ্গেসঙ্গে পাথরের চৌবাচ্চার তলা একদিকে কাত হয়ে উঠতেই ফাঁক দিয়ে সনৎ নীচের দিকে অতলস্পর্শ অন্ধকারে লাফিয়ে পড়ল।

সুশীল ও জামাতুল্লা দু-জনেই চমকে চিৎকার করে উঠল। অমন অতর্কিতভাবে সনৎ লাফ মারতে গেল কেন, ওরা ভেবে পেল না।

কিন্তু লাফ মারলে কোথায়।

জামাতুল্লা সভয়ে বললে–সর্বনাশ হয়ে গেল বাবুজি। তারপর ওরা দুজনেই কিছু না ভেবেই পাথরের চৌবাচ্চার তলার ফাঁক দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল।

ওরা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেলে।

সনৎ অন্ধকারের ভেতর থেকেই বলে উঠল–দাদা, টর্চ জ্বালো আগে, জায়গাটা কীরকম দেখতে হবে—

ওরা টর্চ জ্বেলে চারিদিক দেখে অবাক হয়ে গেল। ওরা একটা গোলাকার ঘরের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেলে–ঘরের দু-কোণে দুটো বড়ো পয়োনালির মতো কেন রয়েছে ওরা বুঝতে পারলে না। ছাদের যে জায়গায় কড়িকাঠের অগ্রভাগ দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবার কথা, সেখানে দুটো বড়ো বড়ো পাথরের গাঁথুনি পয়োনালি, একটা এদিকে, আর একটা ওদিকে। সমস্ত ঘরটায় জলের দাগ, মেঝে ভয়ানক ভিজে ও স্যাঁৎসেঁতে, যেন কিছুক্ষণ আগে ও ঘরে অনেকখানি জল ছিল।

জামাতুল্লা বললে–এ ঘরে এত জল আসে কোথা থেকে বাবুজি?

সুশীল কিছু বলতে পারলে না; প্রকান্ড ঘর, অন্ধকারের মধ্যে ঘরের কোথায় কী আছে ভালো বোঝা যায় না।

সনৎ বললে–ঘরের কোণগুলো অন্ধকার দেখাচ্ছে, ওদিকে কী আছে দেখা যাক–

টর্চ ধরে তিন জনে ঘরের একদিকের কোণে গিয়ে দেখে অবাক চোখে চেয়ে রইল।

ঘরের কোণে বড়ো বড়ো তামার জালা বা ঘড়ার মতো জিনিস, একটার ওপর আর একটা বসানো, ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঁচু। সে-দিকের দেওয়ালের গা দেখা যায় না–সমস্ত দেওয়াল ঘেঁসে সেই ধরনের রাশি রাশি তামার জালা–ওরা এতক্ষণ ভালো করে দেখেনি, সেই তামার জালার রাশিই অন্ধকারে দেওয়ালের মতো দেখাচ্ছিল।

জামাতুল্লা বললে–এগুলো কী বাবুজি?

সুশীল বললে–আমার মনে হয় এটাই ধনভান্ডার।

সনৎ বললে–আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি—

জামাতুল্লা হঠাৎ অন্য দেওয়ালের দিকে গিয়ে বললে–এই দেখুন বাবুজি–

সে-দিকে দেওয়ালের গায়ে বড়ো বড়ো কুলুঙ্গির মতো অসংখ্য গর্ত। প্রত্যেকটার মধ্যে ছোটো-বড়ো কৌটোর মতো কী সব জিনিস।

সুশীল বললে–যাতে-তাতে হাত দিও না; এসব পাতাল-ঘরে সাপ থাকা বিচিত্র নয়। এই ঘোর অন্ধকারে পাতালপুরী বিষাক্ত সাপের রাজ্য হওয়াই বেশি সম্ভব।

কিন্তু চারিদিকে ভালো করে টর্চ ফেলে দেখেও সাপের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সনৎ ও জামাতুল্লা কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটো বার করে দেখলে। ভেতরে যা আছে তা দেখে ওরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল না। এ কী সম্ভব, এত বড়ো একটা প্রাচীন সাম্রাজ্যের গুপ্ত ধনভান্ডারে এত কান্ড করে পাতালের মধ্যে ঘর খুঁড়ে তাতে পুরোনো হরতুকি রাখা হবে?

ওদের হতভম্ব চেহারা দেখে সুশীল বললে–কী ওর মধ্যে?

সনৎ বললে–পুরোনো হরতুকি দাদা—

দূর পাগল–হরতুকি কী রে?

এই দেখো—

সুশীল গোল গোল ছোটো ফলের মতো জিনিস হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে বললে–আমি জানিনে এ কী জিনিস, কিন্তু যখন এত যত্ন করে একে রাখা হয়েছে, তখন এর দাম আছে। থলের মধ্যে নাও দু-এক বাক্স–

সব কৌটোগুলোর মধ্যে সেই পুরোনো হরতুকি!

ওরা দস্তুরমতো হতাশ হয়ে পড়ল। এত কষ্ট করে পুরোনো হরতুকি সংগ্রহ করতে ওরা এতদূর আসেনি।

হঠাৎ সুশীল বলে উঠল–আমার একটা কথা মনে হয়েছে—

সনৎ বললে–কী দাদা?

এ জিনিস যাই হোক, এ-ই ছিল পুরোনো সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রাকারেন্সি–এইআমার স্থির বিশ্বাস। সঙ্গে নাও কিছু পুরোনো হরতুকি–

জামাতুল্লা অনেক কৌশল করে একটা তামার জালা পাড়লে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তার ঢাকনি খোলা গেল না। জামাতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে–এ কি রিবিট করে এঁটে দেওয়া বাবুজি? এ খোলবার হদিশ পাচ্ছি নে যে–

টানাটানি করতে গিয়ে একটা ঢাকনি খটাং করে খুলে গেল।

সনৎ বললে–দেখো ওর মধ্যে থেকে আবার পুরোনো আমলকি না বার হয় দাদা—

কিন্তু জালাটা উপুড় করে ঢাললে তার মধ্যে থেকে বেরোলো রাশি রাশি নানা রং-বেরঙের পাথর। দামি জিনিস বলে মনে হয় না। সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে যেকোনো নদীর ধারে এমনি নুড়ি অনেক পাওয়া যায়।

জামাতুল্লা বললে–তোবা! তোবা! এসব কী চিজ বাবুজি?

কতকগুলো কৌটোর মধ্যে শনের মতো সাদা জিনিসের গুলির মতো। মনে হয় বহুকাল আগে শনের নুড়িগুলিতে কোনো গন্ধদ্রব্য মাখানো ছিল–এখনওতার খুব মৃদু সুগন্ধ শনের নুড়িগুলোর গায়ে মাখানো।

সনৎ বললে–দাদা, ওটা তাদের ওষুধ-বিষুদ রাখার ভাঁড়ার ছিল না তো?

জামাতুল্লা বললে–কী দাওয়াই আছে এর মধ্যে বাবুজি?

তা তুমি আমি কী জানি? প্রাচীন যুগের লোকের কত অদ্‌ভুত ধারণা ছিল। হয়তো তাদের বিশ্বাস ছিল এই সবই অমর হওয়ার ওষুধ।

হঠাৎ সুশীল একটা জালার মুখ খুলে বলে উঠল–দেখি, বোধহয় টাকা! জালা উপুড় করলে তার মধ্যে থেকে পড়ল একরাশ বড়ো বড়ো চাকতি, বড়ো বড়ো মেডেলের আকারের, প্রায় সিকি ইঞ্চি পুরু।

সুশীল একখানা চাকতি হাতে করে বললে–সোনা বলে মনে হয় না?

জামাতুল্লা বললে–আলবৎ সোনা–তবে টাকা বা মোহর নয়।

সুশীল বললে–কোনোরকম ছাপ নেই। মুদ্রা করবার জন্যে এগুলো তৈরি করা হয়েছিল–কিন্তু তারপর ছাপ এতে মারা হয়নি। এ অনেক আছে–

সনৎ বললে–সবরকম কিছু কিছু নাও দাদা—

জামাতুল্লা বললে–এ যদি সোনা হয়–এই এক জালার মধ্যেই লাখ টাকার সোনা—

সুশীল আর একটা জালা পেড়ে ঢাকনি খুলে উপুড় করে ঢাললে। তার মধ্যেও অবিকল অমনি ধাতব চাকতি একই আকারের, একই মাপের।

জামাতুল্লা বললে–শোভানাল্লা! দু-লাখ হল–যদি আমরা দেখি সব জালাতেই এ-রকম–

এই সময় সুশীল প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল–শিগগির এদিকে এসো—

ওরা গিয়ে দেখলে অন্ধকার ঘরের কোণে কতকগুলো মানুষের হাড়গোড়–ভালো করে টর্চ ফেলে দেখা গেল, দুটো নরকঙ্কাল!

সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার পাতালপুরীর মধ্যে নরকঙ্কালদুটো যেন ওদের সমস্ত আশা ও চেষ্টাকে দাঁত বার করে উপহাস করছে। কাল রাত্রে স্বপ্নের কথা ওর মনে এল, মৃত্যুর চেয়ে মহারহস্য জগতে কী আছে? মূঢ় লোকে চারিপাশে মৃত্যু অহরহ দেখছে, অথচ ভাবে না কী গভীর রহস্যপুরীর দ্বারপালস্বরূপ ইহলোক ও পরলোকের পথে মৃত্যু আছে দাঁড়িয়ে।...

নরকঙ্কালটি কী কথা না জানি বলত যদি এরা এদের মরণের ইতিহাস ব্যক্ত করতে পারত? সে হয়তো দুর্নিবার লোভ ও নৃশংস অর্থলিপ্সার ইতিহাস, হয়তো তা রক্তপাতের ইতিহাস, জীবন-মরণ নিয়ে খেলার ইতিহাস, ভাই হয়ে ভায়ের বুকে ছুরি বসানোর ইতিহাস...

জামাতুল্লা কঙ্কালগুলো সরিয়ে রাখতে গিয়ে বললে–হাড় ভেঙে যাচ্ছে বাবুজি বহুৎ পুরোনো আমলের হাড়গোড় এসব। কমসে কম এক-শো-দেড়-শো বছরের পুরোনো–কিন্তু দেখুন বাবুজি মজা, হাড়ের গায়ে এসব কী?

ওরা হাতে করে নিয়ে দেখলে।

প্রায় এক ইঞ্চি করে লবণের স্তর শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে আছে কঙ্কালের ওপরে। সুশীল ভালো করে টর্চের আলো ফেলে বললে–চোখের কোটরগুলো নুনে বুজোনো–দেখো চেয়ে!

এর যে কী কারণ ওরা কিছুই ঠিক করতে পারলে না।

অন্ধকার পাতালপুরীর শহরে ওদের হাড়ে নুন মাখাতে এসেছিল কে?

সে-সময়ে সনৎ বললে–দেখো দাদা, দেখো জামাতুল্লা সাহেব–এটা কীসের দাগ?

ওরা পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে সনৎ টর্চ ফেলে দেওয়ালের গায়ের একটা সাদা রেখার দিকে চেয়ে কথা বলছে। রেখাটা লম্বা অবস্থায় দেওয়ালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টানা।

জামাতুল্লা বললে–এ দাগ নোনা জলের দাগ–খুব টাটকা দাগ।

সুশীল ও সনৎ হতভম্ব হয়ে বললে–তার মানে? জল আসবে কোথা থেকে?

জামাতুল্লা বললে–বড় অন্ধকার জায়গা, ভালো করে কিছুই তো মালুম পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু একবার ভালো করে ঘরের চারিধারে দেখা দরকার। অজানা জায়গায় সাবধান থাকাই ভালো। এত স্যাঁৎসেঁতে কেন ঘরটা, আমি অনেকক্ষণ থেকে তাই ভাবছি।

জামাতুল্লা ও সনৎ হাতড়ে হাতড়ে সোনার চাকতি বের করে থলের মধ্যে একরাশ পুরে ফেলল–পাথরের নুড়িও কিছু নিলে–বলা যায় না যদি এগুলি কোনো দামি পাথর হয়ে পড়ে! বলা যায় কী! সনৎ ছেলেমানুষ, সে এত সোনার চাকতি দেখে কেমন দিশেহারা হয়ে গেল–উন্মত্তের মতো আঁজলা ভরে চাকতি সংগ্রহ করে তার তামার জালার মধ্যে থেকে, আর থলের ভেতর পুরে নেয়। যেন এ আরব্য উপন্যাসের একটা গল্প–কিংবা রূপকথার মায়াপুরী–পাতালপুরীর ধনভান্ডার! বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় বেলা দশটা থেকে বিকেল ছ-টা এস্তেক কলম পিষে সাঁইত্রিশ টাকা ন-আনা রোজগার করতে হয় সারা মাসে। সেই হল। রূঢ় বাস্তব পৃথিবী–মানুষকে ঘা দিয়ে শক্ত করে দেয়।

আর এখানে কী, না–হাতের আঁজলা ভরে যত ইচ্ছে সোনা নিয়ে যাও, হীরে নিয়ে যাও–এ আলাদা জগৎ–পৃথিবীর অর্থনৈতিক আইনকানুনের বাইরে।

বহু প্রাচীনকালের মৃত সভ্যতা এখানে প্রাচীন দিনের সমস্ত বর্বর প্রাচুর্য ও আদিম অর্থনীতি নিয়ে সমাধিগর্ভে বিস্মৃতির ঘুমে অচেতন–এ দিন বাতিল হয়ে গিয়েছে, এ সমাজ বাতিল হয়ে গিয়েছে–একে অন্ধকার গহ্বর থেকে টেনে দিনের আলোয় তুলে বিংশ শতাব্দীর জগতে আর অর্থনৈতিক বিভ্রাট ঘটিও না।...

হঠাৎ কীসের শব্দে সুশীলের চিন্তার জাল ছিন্ন হল–বিরাট, উন্মত্ত, প্রচন্ড শব্দ–যেন সমগ্র নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভেঙে ছুটে আসছে কোথা থেকে–কিংবা শিবের জটা থেকে যেন গঙ্গা ভীম ভৈরব বেগে ইন্দ্রের ঐরাবতকে ভাসিয়ে মর্ত্যে অবতরণ করছেন।

জামাতুল্লার চিৎকার শোনা গেল সেই প্রলয়ের শব্দের মধ্যে–জল! জল! পালান–ওপরে উঠুন–

জামাতুল্লার কথা শেষ না হতে সুশীলের হাঁটু ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত জল উঠল–কোমর থেকে বুক লক্ষ করে দ্রুতগতিতে ওঠবার সঙ্গেসঙ্গে জামাতুল্লা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে– ওই দেখুন বাবু!

সুশীল সবিস্ময়ে ও সভয়ে চেয়ে দেখলে ঘরের ছাদের কাছাকাছি সেই দুটো পয়োনালা দিয়ে ভীষণ তোড়ে জল এসে পড়ছে ঘরের মধ্যে। চক্ষের নিমেষে ওরা ইঁদুর-কলে আটকা পড়ে জলে ডুবে দম বন্ধ হয়ে মরবে!... কিন্তু উঠবে কোথায়! উঠবে কীসের সাহায্যে? এ ঘরে সিঁড়ি নেই আগেই দেখে এসেছে।

সুশীল চিৎকার করে বললে–সনৎ–সনৎ ওপরে ওঠ–শিগগির—

সনৎ বললে–দাদা! তুমি আমার হাত ধরো–হাত ধরো–

তারপর হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল–পুরোনো রাজাদের পোষ-মানা বেতাল যেন কোথায় হা হা করে বিকট অট্টহাস্য করে উঠল–সম্মুখে মৃত্যু! উদ্ধার নেই!

এ জলে সাঁতার দেওয়া যাবে না সুশীল জানে–এ মরণের ইঁদুরকল। বুক ছাপিয়ে জল তখন উঠে প্রায় নাকে ঠেকে-ঠেকে–

কে যেন অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল–দাদা-দাদা–আমার হাত ধরো–দাদা–

একজোড়া শক্ত বলিষ্ঠ হাত ওকে ওপরের দিকে তুললে টেনে। ঘন অন্ধকার। টর্চ কোথায় গিয়েছে সেই উন্মত্ত জলরাশির মধ্যে। সুশীলের প্রায় জ্ঞান নেই। সে ডাকছে–কে? সনৎ?

কোনো উত্তর নেই। কেউ কাছে নেই।

সুশীলের ভয় হল। সে চেঁচিয়ে ডাকলে–সনৎ! জামাতুল্লা!

তার পায়ের তলায় উন্মত্ত গর্জনে যেন একটা পাহাড়ের মাথার হ্রদ খসে পড়েছে। উত্তর দেয় না কেউ-না সনৎ, না জামাতুল্লা।

প্রায় দশ মিনিট পরে জামাতুল্লা বললে–বাবু, জলদি আমার হাত পাকড়ান–

কেন?

পাকড়ান হাত–উপরে উঠব–সাবধান!

সনৎ, সনৎ কোথায়? তাকে রেখে এলে উপরে!

জলদি হাত পাকড়ান–হুঁ—

কত যুগ ধরে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে সে ওঠা প্রলয়ের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে–তারপর কতক্ষণ পরে পৃথিবীর ওপর এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা পাতালপুরীর গহ্বর থেকে! বনের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার যেন ঘনিয়ে এসেছে। সুশীল ব্যথভাবে বললে–সনৎ কই? তাকে কোথায়

জামাতুল্লা বিষাদ-মাখানো গম্ভীরসুরে বললে–সনবাবু নেই–আমাদের ভাগ্য বাবুজি—

সুশীল বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বললে–নেই মানে?

সনবাবু তো পাতালপুরী থেকে ওঠেননি–তাঁকে খুঁজে পাইনি। আপনাকে তুলে ওপরে রেখে তাঁকে খুঁজতে যাব এমন সময় ঘরের মেঝে দুলে উঠে এঁটে গেল। তিনি থেকে গেলেন তলায়–আমরা রয়ে গেলাম ওপরে। তাঁকে খুঁজে পাই কোথায়?

সে কী! তবে চলে গিয়ে খুঁজে আনি!

জামাতুল্লা বিষাদের হাসি হেসে বললে–বাবুজির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, এখনকিছু বুঝবেন না। একটু ঠাণ্ডা হোন, সব বলছি। সনৎবাবুকে যদি পাওয়া যেত তবে আমি তাঁকে ছেড়ে আসতাম না।

কেন? সনৎ কোথায়? হ্যাঁরে, আমি তোকে ছেড়ে বাড়ি গিয়ে মার কাছে, খুড়িমার কাছে কী জবাব দেব?–কেন তুমি তাকে পাতালে ফেলে এলে?

জামাতুল্লা নিজের কপালে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে–নসীব, বাবুজি–

উদভ্রান্ত সুশীলের বিহ্বল মস্তিষ্কে ব্যাপারটা তখনও ঢোকেনি। জলের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে দম বন্ধ হয়ে সনৎ ওপরে উঠবার চেষ্টা করেও উঠতে পারেনি। অন্ধকারের মধ্যে জামাতুল্লাও ওকে খুঁজে পায়নি। ওরই হাত ধরে টেনে তুলবার পরে ঘরের মেঝে এঁটে গিয়ে রত্নভান্ডারের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ওই ঘরে ছাদ পর্যন্ত জল ভরতি হয়ে গিয়েছে এতক্ষণ–সেখানে মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে?

সুশীল ক্রমে সব বুঝলে ওপরে উঠে এসে মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগানোর পরে। একটা গভীর শোক ও হতাশায় সে একেবারে ডুবে যেত হয়তো, কিন্তু ঘটনাবলির অদ্ভুতত্বে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। কোথায় অন্ধকার পাতালপুরীতে পুরাকালের ধনভান্ডার, সে ধনভান্ডার অসাধারণ উপায়ে সুরক্ষিত … এমন কৌশলে, যা একালে হঠাৎ কেউ মাথায় আনতেই পারত না!

জামাতুল্লা বললে–পানি দেখে তখনি আমার সন্দেহ হয়েছে। আমি ভাবছি, এত নোনা পানি কেন ঘরের মধ্যে।

সুশীল বললে–আমাদের তখনই বোঝা উচিত ছিল জামাতুল্লা। তাহলে সনৎ আজ এভাবে–

তখন কী করে জানব বাবুজি? ওই নালিদুটো গাঁথা আছে–ও দিয়ে জোয়ারের সময় সমুদুরের নোনা পানি ঢোকে–দিনে একবার রাতে একবার। আমার কী মনে হয় জানেন বাবুজি, ওই দুটো নালি এমন ফন্দি করে গাঁথা হয়েছিল যে–

সুশীল বললে–আমার আর একটা কথা মনে হয়েছে জান? ওই দুটো নরকঙ্কাল যা দেখলে, আমাদেরই মতো দুটো লোক কোনোকালে ওই ঘরে ধনরত্ন চুরি করতে গিয়ে সমুদ্রের নোনা জলে হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মরেছে। মুখের মতো ঢুকেছে, জানত না। যেমন আমরা–সনৎ যেমন–

কী জানত না?

যে স্বয়ং ভারত মহাসমুদ্র প্রাচীন চম্পারাজ্যের রত্নভান্ডারের অদৃশ্য প্রহরী। কেউ কোনোদিন সে-ভান্ডার থেকে কিছু নিতে পারবে না, মানমন্দিরের রত্নশৈল তার একখানি সামান্য নুড়িও হারাবে না। সুশীল বললে–কিন্তু জল যায় কোথায় জামাতুল্লা? এত জল? আমার কী মনে হয় জান—

আমারও তা মনে হয়েছে। ওই ঘরের নীচে আর একটা ঘর আছে, সেটা আসল ধনভান্ডার। বেশি জল বাধলে ঘরের মেঝে একদিকে ঢাল হয়ে পড়ে জলের চাপে–সব জল ওপরের ঘর থেকে নীচের ঘরে চলে যায়।

সুশীল বললে–স্টিম পাম্প আনলেও তার জল শুকোনো যাবে না, কারণ–তাহলে গোটা ভারত মহাসাগরকেই স্টিম পাম্প দিয়ে তুলে ফেলতে হয়–ওর পেছনে রয়েছে গোটা ভারত সমুদ্র। সে জামাতুল্লার দিকে চেয়ে বিষাদের সুরে বললে–এইহল তোমার আসল বিন্ধ্যমুনি সমুদ্র, বুঝলে জামাতুল্লা?

ওরা সেই বনের গভীরতম প্রদেশের একটা পুরোনো মন্দির দেখলে। মন্দিরের মধ্যে এক বিরাট দেবমূর্তি, সুশীলের মনে হল, সম্ভবত বিষ্ণুমূর্তি।

যুগযুগান্ত কেটে গেছে, মাথার ওপরকার আকাশে শত অরণ্যময়ূরীদের নর্তন শেষ হয়ে আবার শুরু হয়েছে, রক্তাশোকতরুর তলে কত সুখসুষুপ্ত হংসমিথুনের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে– সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে ঘৃতপক্ক অমৃতচরুর চারু গন্ধে মন্দিরের অভ্যন্তর কতদিন হয়েছে আমোদিত–কত উত্থান, কত পতনের মধ্যে দেবতা অবিচল দৃষ্টিতে বহুদূর অনন্তের দিকে চেয়ে আছেন, মুখে সুকুমার সব্যঙ্গ মৃদু চাপা হাসি–নিরুপাধি চেতনা যেন পাষাণে লীন, আত্মস্থ।

সুশীল সসম্ভ্রমে প্রণাম করল-দেবতা, সনৎ ছেলেমানুষ–ওকে তোমার পায়ে রেখে গেলুম–ক্ষমা করো তুমি ওকে!

* * * *

সুশীল কলকাতায় ফিরেছে।

কারণ যা ঘটে গেল, তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ইয়ার হোসেন সন্দেহ করেনি। সনৎ একটা কূপের মধ্যে পড়ে মরে গিয়েছে শুনে ইয়ার হোসেন খুঁজে দেখবার আগ্রহও প্রকাশ করেনি। চীনা মাঝি জাঙ্ক নিয়ে এসেছিল–তারই জাঙ্কে সবাই ফিরল সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়ান মেলবোট ধরে কলম্বো।

কলম্বোর এক জহুরির দোকানে জামাতুল্লা সেই হরতুকির মতো জিনিস দেখাতেই বললে –এ খুব দামি জিনিস, ফসিল অ্যাম্বার–বহুকালের অ্যাম্বার কোনো জায়গায় চাপা পড়ে ছিল।

দু-খানা পাথর দেখে বললে–আনকাট এমারেল্ড, খুব ভালো ওয়াটারের জিনিস হবে কাটলে। আন্নামালাইয়ের জহুরিরা এমারেল্ড কাটে, সেখানে গিয়ে কাটিয়ে নেবেন। দামে বিকোবে।

সবশুদ্ধ পাওয়া গেল প্রায় সত্তর হাজার টাকা। ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি না দিয়ে ওরা তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দশ হাজার টাকা পাঠালে–সেই মাদ্রাজি বিধবাকে পাঠালে বিশ হাজার–বাকি টাকা তিন ভাগ হল জামাতুল্লা, সনতের মা ও সুশীলের মধ্যে।

টাকার দিক থেকে এমন কিছু নয়, অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেকখানি। কত রাত্রে গ্রামের বাড়িতে নিশ্চিন্ত আরাম-শয়নে শুয়ে ওর মনে জাগে মহাসমুদ্র-পারের সেই প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের অরণ্যাবৃত ধ্বংসস্তূপ ... সেই প্রশান্ত ও রহস্যময় বিষ্ণুমূর্তি ... হতভাগ্য সনতের শোচনীয় পরিণাম ... অরণ্য মধ্যবর্তী তাঁবুতে সে-রাত্রির সেই অদ্‌ভুত স্বপ্ন। জীবনের গভীর রহস্যের কথা ভেবে তখন সে অবাক হয়ে যায়।

জামাতুল্লা নিজের ভাগের টাকা নিয়ে কোথায় চলে গেল, তার সঙ্গে আর সুশীলের দেখা হয়নি।